শারীয়াত ও শিরকের মানদণ্ডে কবর যিয়ারত

মূলঃ আরবী
ইমাম মহিউদ্দীন আল বারকাভী(রোহঃ)

ভাষান্তরেঃ
আ, ছ, ম, তরিকুল ইসলাম

44

COOPERATIVE OFFICE FOR CALL AND GUIDANCE IN AL-BATHA
(UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS)
P.B.No 20824 - Riyadh 11465 K.S.A.
Tel. 4030251 - 4083405 FAX. 4059387

শারীয়াত ও শিরকের মানদণ্ডে কবর যিয়ারত

মূলঃ আরবী
ইমাম মহিউদ্দীন আল বারকাভী(রোহঃ)

ভাষান্তরেঃ
আ, ছ, ম, তরিকুল ইসলাম

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

কবর পূজার জঘন্য ফিতনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত আমাদের সমাজ। এই ভয়াবহ শিরক হতে মুক্ত হওয়া সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পুস্তকটি অনুদিত হলো। অনুবাদে যা নির্ভুল হয়েছে তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোথাও ভুল থাকলে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহ, আমাদের সমাজকে এ পুস্তক হতে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আ,ছ,ম, তরিকুল ইসলাম
তথ্য মন্ত্রনালয়
রিয়াদ, সৌদী আরব
হিজরী - ১৪১৫ হিঃ

সূচীপত্র

১। লেখকের জীবনী ১

২। ভূমিকা ৫

৩। রাসূল(সঃ) এর অনুসরণ ও শয়তানের বিরোধীতা ৮

৪। মূর্তিপূজার গোড়ার কথা ৯

৫। কবরকে মসজিদে পরিণত করতে রাসূল(সঃ) নিষেধ করেছেন ১৩

৬। কবরের উপরে ঘর তৈরীর অপকারীতা ১৬

৭। কবরে নিষিদ্ধ কাজ কবরবাসীর মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখে ৩১

৮। প্রতিকৃতি মিটিয়ে দেয়া ও উঁচু কবর সমতল করার নির্দেশ ৩৪

৯। বর্ণিত হাদীস সমূহের অপব্যাখ্যা ও তার প্রতি উত্তর ৪০

১০। কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করার অশুভ পরিণতি ৪৬

১১। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ বিদয়াত ৫৬

১২। কবর যিয়ারতের অনুমোদিত হাদীস সমূহ ৬১

১৩। শরীয়ত সম্মত কবর যিয়ারতের পদ্ধতি ৬২

১৪। কবরে কুরআন পাঠ ও তার হুকুম ৬৭

১৫। শরীয়ত সম্মত কবর যিয়ারত ও শির্‌কী কবর যিয়ারত ৭০

১৬। শাফায়াত (সুপারিশ) এর প্রসংগে আলোচনা ৭৬

১৭। মৃতব্যক্তি যিয়ারতকারীর দোয়ার মুখাপেক্ষী ৯২

১৮। কবর পূজার ফিতনা বিষয়ে মুসলিম মনিষীদের উক্তি ও কর্মকাণ্ড ১০২

১৯। ফিতনার ভয়ে ওমর(রাঃ) এর নির্দিষ্ট গাছ কাটার নির্দেশ ১০৮

২০। রাসূল(সঃ) এর আনীত শরীয়তের প্রতি মুর্খতাই মানুষদেরকে শিরকে নিপাতিত করেছে ১১৭

২১। আল্লাহ ব্যতিত কারো কাছে দোয়া করা প্রসংগে আলোচনা ১২৪

২২। ইসলামের আলোকে বিপদ আপদের সময় করণীয় ১৩৮

লেখকের জীবনী

যারা ইসলামকে গুরুত্ব দেন, বিদ্যা অর্জন করেন, বিদ্যায় পরিপূর্ণতা লাভ করেন; আশ্-শাইখ মুহিউদ্দীন তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি 'বারকাভী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যৌবন কালে তিনি খ্যাতনামা শিক্ষকদের সংস্পর্শ লাভে ধন্য হন। তিনি 'বালি কিসরা' এলাকায় জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত আলিম। দ্বীনী বিদ্যাপীঠের শিক্ষক।(এসমস্ত বিদ্যাপীঠে যে গুপ্ত জ্ঞান নিহীত রয়েছে তা গর্বহীন ভাবে বলা যায়)।

বিদ্যার্জনের মধ্য দিয়েই আশ্-শাইখ বারকাভী বেড়ে উঠেন। তিনি যুগবরেণ্য মনিষীদের কাছ থেকে বহুমুখী বিদ্যালাভ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে 'আখিযাদাহ' নামে প্রসিদ্ধ মহিউদ্দীন ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বাদশাহ্ সুলাইমানের শাসনামলে সামরিক বিচারক আব্দুর রহমানের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। পরে তিনি দ্বীনের সংস্কারক ও দুনিয়াত্যাগী হওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন। সফলতার চিহ্ন তাঁর কপালে

প্রস্ফুটিত হলো। দ্বীনি মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাঁর এক শিক্ষক তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন- বিদ্যার্জন করতে,পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের) কাজে মনোযোগী হতে। ভয়ভীতির মাধ্যমে মানুষদেরকে ওয়াজ নছীহত করতে।

তদানিন্তন কালের বিখ্যাত আলিম আতাউল্লাহ(রাহঃ) এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি 'বরকী' শহরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিক্ষক হিসাবে লেখককে সেখানে নিয়োগ করেন। প্রত্যহ ষাট দিরহাম করে তাঁর বেতন নির্ধারিত হয়। সেসময় লেখক যথাসম্ভব কখনো শিক্ষকতার কাজ কখনো বক্তৃতা দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেন।

বিভিন্ন প্রান্তর থেকে বিভিন্ন শ্রেনীর ছাত্ররা তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য সমবেত হতেন। তিনি রাত দিন তাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর

বক্তৃতা ও শিক্ষাদান থেকে অনেকেই প্রচুর লাভবান হতেন। মূর্খের জঙ্গলে বন্দী,দুনিয়ার ধান্ধায় ব্যস্ত ও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত অনেকেই তাঁর সংশ্রবে বিদ্যালাভ করে ধন্য হন। বহু আত্মপূজক তাঁর সান্নিধ্যে হিদায়েতের পিযুষ ধারা পান করতে সক্ষম হন।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি অসংখ্য বই পুস্তক হতে জ্ঞান আহরণ করতেন। এই বিদ্যানুরাগী বিদ্যার্চচা করে বিদ্যা বিশারদে পরিণত হন। তাঁর লিখিত গ্রন্থরাজি তাঁর ইলমের গভীরতার সাক্ষ্য দানের জন্য যথেষ্ট। তিনি আরবী ব্যাকরণে "শরহে মুখতাছারুল বায়দাবী",অত্যন্ত সুক্ষ ভাষায় ফারায়েদের গ্রন্থ ছাড়াও তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে টিকা ও পুস্তিকা রচনা করতে থাকেন তবে মৃত্যুরঅনষি সংকেত তাকে তার আশা পুরণ করতে দেয়নি।

তিনি ছিলেন পরহিজগার ও মুত্তাকী। তিনি দ্বীনকে পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করতেন। স্থান-কাল- পাত্রের পার্থক্য না করে তিনি সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। ইসলামের প্রশ্নে তিনি

ছিলেন আপোষহীন। যতবড় মর্যাদাবানই হোকনা কেন, শরীয়তের বিরোধী হলে তাকে তিনি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করতেন। শেষ জীবনে তিনি কুস্তনতনিয়াতে (বর্তমানে যার নাম ইস্তাম্বুল) আগমন করেন। তিনি মুহাম্মদ পাশার মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করেন এবং তরবারীর চেয়ে তীক্ষ্ম কণ্ঠে অত্যাচার প্রতিরোধ ও অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রতিরক্ষার দাবী জানান। তিনি অবশেষে ইবাদত ও পরহিজগারীতে আকণ্ঠ মগ্ন অবস্থায় ৯৮১ হিজরীর জামাদিউল উলা মাসে ইন্তিকাল করেন।

* * * *

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম দাতা ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য সকল প্রশংসা যিনি মানুষদেরকে সংমিশ্রিত বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন শ্রবন করা ও দেখার যোগ্যতা। সন্ধান দিয়েছেন সুপথ ও কুপথের। তন্মধ্যে কেউ বেহেস্তের পথ বেছে নিয়েছে কেউবা বেছে নিয়েছে প্রখর প্রজ্জ্বলিত আগুনের পথ। অতঃপর দয়া-শান্তি অবতীর্ন হোক ও সালাম সেই মহামানবের প্রতি যিনি শাশ্বত সত্য নিয়ে প্রেরিত; ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী- সকল নবীকূল শিরমণি। যিনি আল্লাহর নির্দেশেই আল্লাহর দিকে আহবান কারী। যিনি প্রদীপ্ত আলোক রশ্মি। তাঁর পরিবার পরিজন ও যারা তাঁর সাহায্য কারী হিসেবে দ্বীনকে জীবিত করেছেন তাদের এই জিহাদকার্য পরিচালনায় আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক মনে করেন নাই - তাদের প্রতিও দরূদ ও সালাম।

অতঃপর- আমি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত পৃষ্ঠাগুলো আশ শাইখ আল-ইমাম আল-আল্লামাহ্ ইবনি কাইয়ীম আল-জাওযিয়ার "ইগাছাতুল লুহফান ফী মাছায়িদিশ শায়তান" গ্রন্থ হতে চয়ন করেছি। আল্লাহ যে সমস্ত আত্মার প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর আত্মাকেও তিনি তাদের অর্ন্তভূক্ত করুন।(আমীন)। পরকালের ভয়ে ভীত ভাইদের উদ্দেশ্যে অন্যান্য গ্রহনযোগ্য গ্রন্থ হতে আরো তথ্য সংযুক্ত করে আমি এই পুস্তকটি রচনা করলাম কারণ অনেকেই এই যুগে কবরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। তারা কবরের কাছে নামায আদায় করে। তারা কবরে কুরবানী দান করে এবং কবর সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা ঈমানদার দের কথার পরিপন্থী। যারা ঈমানকে শুদ্ধ করতে চায়, শয়তানের শৃংঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার অভিপ্রায় রাখে এবং আগুনের আযাব থেকে মুক্তির প্রত্যাশী- বেহেস্তে প্রবেশ করতে আগ্রহী; আমি তাদের জন্য কবর সম্পর্কে শরীয়তের সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। যাতে তাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে সত্য মিথ্যার পার্থক্য হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালাই হিদায়াতের মালিক। তাঁর উপরেই ভরসা করছি।

* * * *

(রাসূল(সঃ) এর অনুসরণ ও শয়তানের বিরোধীতা)

জেনে রাখুন যে, ইহকাল ও পরকালের উত্তম সৌভাগ্য ও অবর্ননীয় সম্মান রাসূল (সঃ) এর সঠিক অনুসরন ছাড়া অসম্ভব। শয়তান মানুষের চরম শত্রু। অসংখ্য ধোকাবাজীর মাধ্যমে সঠিক পথ থেকে তাদেরকে পথভ্রষ্ঠ করার জন্য সে সদা ব্যস্ত। সে তাদেরকে বড় গুনাহের দিকে আহবান করে, যাতে তারা চিরস্থায়ী দোযখের অধিবাসী হয়। ঈমান বিধ্বংস করাই হচ্ছে তার বিদ্রোহের আসল লক্ষ্য।

* * * *

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম দাতা ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য সকল প্রশংসা যিনি মানুষদেরকে সংমিশ্রিত বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন শ্রবন করা ও দেখার যোগ্যতা। সন্ধান দিয়েছেন সুপথ ও কুপথের। তন্মধ্যে কেউ বেহেস্তের পথ বেছে নিয়েছে কেউবা বেছে নিয়েছে প্রখর প্রজ্জ্বলিত আগুনের পথ। অতঃপর দয়া-শান্তি অবতীর্ন হোক ও সালাম সেই মহামানবের প্রতি যিনি শাশ্বত সত্য নিয়ে প্রেরিত; ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী- সকল নবীকূল শিরমণি। যিনি আল্লাহর নির্দেশেই আল্লাহর দিকে আহবান কারী। যিনি প্রদীপ্ত আলোক রশ্মি। তাঁর পরিবার পরিজন ও যারা তাঁর সাহায্য কারী হিসেবে দ্বীনকে জীবিত করেছেন তাদের এই জিহাদকার্য পরিচালনায় আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক মনে করেন নাই - তাদের প্রতিও দরূদ ও সালাম।

(মূর্তিপূজার গোড়ার কথা)

আল্লাহর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছাড়া যে ফিৎনা থেকে মুক্তি লাভ অসম্ভব, যে ফিৎনার দিকে শয়তান অধিকাংশ মানুষদের টেনে নিয়ে যায়; কবরের ফিৎনা তম্মধ্যে অন্যতম। শয়তান অতিতে ও বর্তমানে তার দল ও বন্ধুদেরকে কবরে ফিতনার পক্ষে উপদেশ দিয়েছে। এ ধোকার কারণে বিষয়টি এমন ভাবে গড়িয়েছে যে, মানুষরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের সমাজের প্রসিদ্ধ সাধু স্বজনদের পূজা শুরু করেছে। ইবাদাত করছে তাদের কবরে। কবরকে রূপান্তরিত করেছে মূর্তিতে। কবরের উপরে বানিয়েছে কবরবাসীর প্রতিকৃতি। আসলে একাজগুলো ধারাবাহিক ভাবেই হয়েছে। প্রথমে তারা উক্ত কবরবাসীর ছবি এঁকেছিল। পরে তার ছবিকে কল্পিত একটি প্রতিকৃতিতে রূপ দিয়েছিল। অতঃপর সেটাকে মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। আরো পরে এসে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেটাকে পূজাই শুরু করে। এ সংক্রামক ব্যাধির সর্বপ্রথম উৎপত্তি হয়

হযরত নূহ(আঃ) এর গোত্রে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لاتذرن آلهتكم ولاتذرن ودا ولاسوعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.

অর্থাৎ " নূহ (আঃ) বললেন- হে আমার প্রতিপালক; তারা আমার অবাধ্য হয়েছে, তারা এমন কিছুকে অনুসরণ করেছে, যার সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ তার ক্ষতি সাধন ছাড়া আর কিছুই করে নাই। আর তারা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র করেছে (আমার বিরুদ্ধে) এবং তারা বলছে যে, তোমরা তোমাদের ইলাহ্দের (উপাস্যদের) এবং ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসর কে কক্ষনো পরিত্যাগ করবে না।" (সুরা নূহ ২১-২৩)

পূর্ববর্তী মনিষীদের মধ্যহতে হযরত ইবনি আব্বাস(রাঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেন যে -"আয়াতে বর্ণিত ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসর হযরত নূহ (আঃ) এর গোত্রের মধ্যে সজ্জন ছিলেন। তারা ইন্তিকাল করলেন, শুরু হলো তাদের কবরে

লোকদের অবারিত আনাগোনা। প্রথমতঃ তাদের ছবি ও পরে প্রতিকৃতি তৈরী করা হলো তাদের কবরে। তারপর সময় গড়িয়ে গেল। অবশেষে তাদের গোত্ররা এগুলোকে পূজা করতে শুরু করল। এটাই ছিল মূর্তি পূজার গোড়ার কথা। তারা দুই ফিৎনাকে একত্র করেছিল। কবরের ফিৎনা ও প্রতিকৃতি নির্মানের ফিৎনা। বুখারী ও মুসলিম উভয়েরই সংকলিত হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত ছহীহ হাদীসে রাসূল(সঃ) এ দুই ফিৎনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন-

عن عائشة- رضى الله عنها- أن أم سلمة ذكرت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذ كرت مارأته فيها , وقال رسول الله ـ صلى اله عليه وسلم ـ أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى

হযরত আয়িশা(রাঃ) হতে বর্ণীত হয়েছে যে - "হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) হাবশার ভূখে দেখে আসা মারিয়াহ নামে খ্যাত গীর্জা সম্পর্কে

রাসূল(সঃ) কে বললেন। রাসূলুল্লাহ(সঃ) তা শুনে বললেন যে- ' তারা এমন সম্প্রদায় ভূক্ত যারা তাদের মধ্য থেকে কোন সজ্জন মারা গেলে তার কবরের উপর মাসজিদ তৈরী করে। তারা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পাপী জীব।' "

আলোচ্য হাদীসে প্রতিকৃতি ও কবর উভয় বিষয়কেই উল্লেখ করা হয়েছে। কবরের এ ফিৎনা থেকে জঘন্য মূর্তি পূজার উৎপত্তি। এর কারনে রাসূল(সঃ) বিভিন্ন ভাবে এ ফিৎনার নিকটে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন।

* * * *

(তম্মধ্যে অন্যতম এটি যে,কবরকে মসজিদে পরিণত করতে রাসূল(সঃ) নিষেধ করেছেন)

যেমন বর্নিত হয়েছেঃ---

عن جندب بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه أنه قال – سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يموت بخمس يقول – ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك .

হযরত জুনদব বিন আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন - "আমি রাসূলুল্লাহ(সঃ) কে তাঁর ইন্তিকালের পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি যে-'হুশিয়ার ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদে পরিনত করেছিল। হুশিয়ার ! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি এ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।' " (ছহীহ মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সঃ) যে রোগ

থেকে আর আরোগ্য লাভ করেননি সেই রোগগ্রস্থ অবস্থায় বলেছেন- "ইয়াহুদী ও নাছারারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। আল্লাহর লানত ও অভিশাপ তাদের উপর বর্ষিত হোক।"

রাসূল (সঃ) এখানে তারা যা করেছে তা থেকে সবাইকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। হযরত আয়িশা(রাঃ) বলেন-"যদি তা না হতো, তাহলে তাঁর কবরকে(জাঁকজমক পূর্ণ) উঁচু করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু অন্যরা তাঁর কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে পারে,(তার জন্যই তাঁর কবরকে উঁচু করা হয় নাই ।"

রাসূল(সঃ) এর কবর জাঁকজমক পূর্ণ না হওয়ার কারণ হচ্ছে তাঁর কবর যেন মসজিদে রূপান্তরিত না হয়। রাসূল(সঃ) তিরোধান লাভ করলেন। তাঁর দাফনের জায়গা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখাদিল। অবশ্য যখন তাঁরা শুনলেন যে, রাসূল(সঃ) বলেছেন- "নবীরা যেখানেই ইন্তিকাল করেন, সেখানেই তাদেরকে দাফন করা হয়।" তখন সকলেই মনে প্রাণে তা গ্রহন করে

নিলেন। সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তিদেরকে মাঠে ময়দানে কিংবা কবরস্থানে দাফন করা হয়। নবী(আঃ) দের ক্ষেত্রে তা না করে যে ঘরে তাঁরা ইন্তিকাল করেন সেখানেই দাফন করার এই ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম এই জন্য; যাতে তাঁদের কবরে কেউ নামায আদায় না করতে পারে। কেউ যাতে তাঁদের কবরকে মসজিদে পরিণত করতে না পারে। কেননা রাসূল(সঃ) তাঁর শেষ ভাষনে কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করে গেছেন। অতঃপর এ কাজের জন্য আহলি কিতাবদের উপর অভিসম্পাতের কথা উল্লেখ করে এটা যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে গেছেন।

* * * *

(কবরের উপরে ঘর তৈরীর অপকারিতা)

স্পষ্ট ছহিহ হাদীসের আলোকে দলমত নির্বিশেষে সকল আলিমরা কবরের উপর মসজিদ তৈরীকে নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) এটা হারাম বলে মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। আলিমদের উপর ভাল ধারণা বশতঃ আমরা ধরে নেব, এখানে 'মাকরূহ' বলতে তাঁরা 'মাকরূহ তাহরীমী' বুঝিয়েছেন। কেননা রাসূল(সঃ) হতে বর্ণিত মুতাওয়াতের হাদীসে এ কাজের কর্মীকে অভিসম্পাত দেয়া ও এথেকে স্পষ্ট নিষেধ করার পরও কেউ এটাকে বৈধ বলতে পারেনা।

কবরের ফিৎনার নিকটবর্তী হওয়ার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে রাসূল(সঃ) এর পক্ষ থেকে বর্ণনার মধ্যে এটি একটি যে, তিনি কবরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন। যেমন--

روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس -رضي الله عنهما -أنه عليه السلام لعن زائرات القبور و المتخذ ين عليها المساجد

"ইমাম আহমদ ও সুনান গ্রন্থ (তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইবনেমাজা গ্রন্থ) সংকলকগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে,-'নিশ্চয় রাসূল(সঃ) কবর যিয়ারত কারিনী মহিলা, কবরকে মসজিদে রূপান্তরকারী ও কবরে বাতি দানকারীদের প্রতি অভিসম্পাত দিয়েছেন।' "

সুতরাং রাসূল(সঃ) যে সকল কাজের জন্য লানত ও অভিসম্পাত দিয়েছেন, তার সবগুলোই কবীরা গুনাহের পর্যায় ভুক্ত। ফিকাহবীদদের নিকট এগুলো হারাম। আবু মুহাম্মাদ মাকদিসী(রাহঃ) বলেন -" যদি কবরে বাতি জ্বালানো বৈধ হতো, তবে এ কাজ যে করে তাকে অভিসম্পাত দেয়া হতো না অথচ অভিসম্পাত দেওয়া হয়েছে। এ অভিসম্পাত দেয়ার কারণ এটাই যে, কোন লাভ ছাড়াই এ কাজে সম্পদ অপচয় হয়। মূর্তিকে যেমন শ্রেষ্ঠ মনে করে সম্মান দেখান হয়, কবরকেও ঠিক তেমনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়। এই জন্য আলিমগণ বলেছেন যে, কবরে মোমবাতি, তেল বা

অন্য কিছু যাই হোকনা কেন দান করা ও মানত করা একেবারেই না জায়েয বা অবৈধ। কেননা কোন গুনাহের কাজে মানত করলে সে মানত পূরন করা বৈধ নয় বলে সকল আলিমগণ একমত। এ জন্যই ওয়াকফ কার্যকরী করার ভিত্তি শরীয়তে নেই।"

কবরের ফিৎনার নিকটবর্তী হওয়ার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে রাসূল(সঃ) এর পক্ষ হতে বর্ণনার মধ্যে এটিও একটি যে, রাসূল(সঃ) কবর গাঁথা ও কবরের উপর ঘর তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

كما روى مسلم في صحيحه عن جابر- رضي الله عنه- أنه عليه السلام نهى عنتجصيص القبر و أن يبني عليه.

ইমাম মুসলিম(রাহঃ) তাঁর ছহীহ হাদীস গ্রন্থে হযরত জবির(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে - "রাসূল(সঃ) কবর গাঁথা ও কবরের উপর কোনকিছু তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।" কথিত আছে যে, হাদীসটি দুটি অর্থ বহন করে ঃ- প্রথমতঃ কবরের উপর পাথর, ইট, প্রভৃতি দিয়ে কোন কিছু তৈরী করা। দ্বিতীয়তঃ গালিচা বা অন্য কিছু দ্বারা কবর আবৃত করা। এ উভয় প্রকার কাজই নিষিদ্ধ। কেননা

এটা অহেতুক। এ দ্বারা অর্থের অপচয় হয়। নিষিদ্ধতার অন্য কারণ হচ্ছে এটা জাহেলী সংস্কৃতি।

নিষিদ্ধতার বর্ণনা সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, রাসূল (সঃ) কবরের উপর কোন কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন-

كما روى أبوداود في سنه عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبور و أن يكتب عيها.

"আবু দাউদ (রাহঃ) তাঁর সুনান গ্রন্থে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন –রাসূল (সঃ) কবর গাঁথা ও কবরের উপর কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।"

তম্মধ্যে এটিও যে, রাসূল(সঃ) কবর খনিত মাটি ব্যাতীত অন্য মাটি কবরের উপরে দিতে নিষেধ করেন।

كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبر أو يكتب عليه أويزاد عليه .

"যেমন আবু দাউদ (রাহঃ) হযরত জাবির (রাঃ) হতে আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সঃ)

কবর গাঁথা, এর উপর কিছুলেখাও কবরের খনিত মাটি ছাড়া এর উপরে অধিক মাটি দিতে নিষেধ করেছেন।"

তন্মধ্যে এটিও যে, রাসূল (সঃ) কবরের নিকটে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

كما روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أنه عليه السلام قال- لا تجلسوا على القبور و لاتصلوا إليها.

যেমন ইমাম মুসলিম তাঁর ছহীহ গ্রন্থে হযরত মারয়াদ আল গানাভী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় রাসূল(সঃ) বলেছেন-" তোমরা কবরের উপর উপবেশন করবেনা এবং নামাযও আদায় করবে না।"

و قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا مقبرة و الحمام -رواه الإمام أحمد وأهل السنن.

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন-" কবর ও গোসল খানা ছাড়া সকল ভূখ ই মসজিদ হওয়ার উপযুক্ত।" ইমাম আহমদ(রাহঃ) ও আহলিসুনান (আবুদাউদ,

তিরমিযি, ইবনি মাজাহ ও নাসায়ী(রোহঃ)) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

এসব কাজকে শক্ত ভাষায় নিন্দা করাহয়েছে। এসব কাজগুলো থেকে নিষেধ কারী আরো বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। কেননা কবরকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করাই হচেছ মূর্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে সিজদাহ করা ও মূর্তিদের নৈকট্য লাভের আকাংখা করার সমতুল্য। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, মূর্তি পূজার উৎপত্তি হয়েছে কবরের ফিৎনা থেকে। আহলি কিতাব তাদের নবী (আঃ) দের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল এ জন্যই রাসূল(সঃ) তাদের লানত করেছেন। এসমস্ত মূর্খরা তাদের নবী(আঃ) দের যে সমস্ত জায়গায় দাফন করা হয়েছে সেখানে নামায আদায় করত। তারা এটা করত।

প্রথমতঃ এ ভেবে যে তাদের কবরে সিজদাহ করলে তাদের কবরকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করা হলো। বস্তুতঃ এটি প্রকাশ্য শিরক। এজন্যই রাসূল(সঃ) বলেছেন-

اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد

"হে আমার আল্লাহঃ আমার কবরকে পূজার মূর্তিতে পরিণত করোনা।"

দ্বিতীয়তঃ তারা এ ভেবে এ কাজ করত যে, নামায আদায়ের সময় তাদের কবর মুখী হওয়া আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার। কারণ এ দ্বারা আল্লাহরও ইবাদাত করা হলো এবং তাঁর নবী(আঃ) দেরও সম্মান প্রদর্শন করা হলো। বস্তুতঃ এ কাজ প্রকাশ্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনুল কাইয়ীম(রাহঃ) তাঁর 'ইগাছা' গ্রন্থে তাঁর শাইখ(শিক্ষক) ইবনি তাইমিয়া(রাহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন - কবরকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে শরীয়ত বিশেষ কারণে নিষেধ করেছে। কেননা সেই একই কারণ অনেক উম্মতদেরকে বড় শিরক অথবা ছোট শিরক করতে প্রেরণা দিয়েছে। কেননা গাছ ও পাথরকে আল্লাহর সাথে শরীক করার চেয়ে কোন কবরে মঙ্গলের প্রার্থনা করা আত্মার কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য। একারণেই আমরা অনেককেই কবরের নিকট আত্মা বিলায়ে কান্নাকাটি, বিনয় অবনত চিত্তে দোয়া ও ইবাদাত করতে দেখি, যেমনটি তারা কোন মসজিদে বা শেষ রজনীতেও

করেনা। অনেকেই কবরের নিকট নামায আদায় করে অথবা কবরে সিজদা দিয়ে এমন বরকতের আশা করে যা মসজিদে নামায আদায় করেও করেনা। এ সমস্ত জঘন্য অনিষ্টতার দিকে লক্ষ্য করেই রাসূল(সঃ) উদাত্ত কণ্ঠে কবরের উদ্দেশ্যে নামায নিবেদিত না হলেও কবরে বা কবরস্থানে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

মুসলমানরা সূর্যের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করেনা। তবু সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দুপুর বেলা মুশরিকরা সুর্যকে পূজা করে বিধায় রাসূল(সঃ) তাঁর উম্মতদেরকে এসময় নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কবরস্থানের নামায অধিক বরকত রয়েছে মনে করে যদি সেখানে কেউ নামায আদায় করে তাহলে এটা প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহর এবং তাঁর রাসুলের প্রদর্শিত পথের বিরোধী ও দ্বীন ইসলামের পরিপন্থী। এটি দ্বীনের ভিতর নতুন সংস্করণঃ আল্লাহ যার অনুমতি দেননি। কেননা ইবাদত বস্তুতঃ রাসূল(সঃ) এর অনুসরণ ও অনুকরণেরই নাম। নিজের ইচ্ছাকে বলবৎ করা বা নুতন সংস্করণের সেখানে কোন অবকাশ নেই। মুসলমানেরা সকলেই

এ বিষয়ে এক মত যে, তারা তাদের নবী(আঃ) থেকে কবরস্থানে নামায আদায় যে একেবারেই নিষিদ্ধ - এ শিক্ষাটাই লাভ করে ছেন।

পথভ্রষ্ট লোকরা দাবী করে যে, রাসূল(সঃ) শুধু ঐ কবরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যে কবর থেকে লাশের ধ্বংসাবশেষ প্রকাশ হয়ে অপবিত্রতা ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ রাসূল(সঃ) এ হাদীসগুলোতে যা বুঝাতে চেয়েছেন তারা তা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। বরঞ্চ তাদের এ গোড়ামীপূর্ণ দাবী কয়েকটি কারণে ভিত্তিহীন ঃ-

প্রথমতঃ বর্ণিত হাদীস সমূহে কোথাও লাশের ধ্বংসাবশেষ বের হয়ে পড়া কবর ও অবিকৃত কবরের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ রাসূল(সঃ) ইহুদী ও নাছারাদের প্রতি পূর্বোক্ত হাদীস গুলোতে অভিসম্পাত দিয়েছেন। কেননা তারা তাদের নবী(আঃ)দের কবর সমূহ মসজিদে পরিণত করেছিল। আর এটা ধ্রুব সত্য যে, কবর থেকে তাঁদের লাশের ধ্বংসাবশেষ বাইরে ছড়িয়ে পড়ার কারণে তিনি এ অভিসম্পাত দেননি। কেননা নবী(আঃ)দের লাশ কবরে পঁচেনা-

গলেনা। বা নাপাক হয়না। কারণ আল্লাহ মাটির প্রতি নবী(আঃ)দের পবিত্র শরীর ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন। নবী(আঃ) গন কবরে সব সময় তাজা থাকেন।

তৃতীয়তঃ রাসূল(সঃ) বলেছেন ,"কবরস্তান ও গোসলখানা ছাড়া সমস্ত ভূখণ্ডই মসজিদ হওয়ার উপযুক্ত।" যদি এ নিষেধাজ্ঞা কবর থেকে লাশ প্রকাশিত হওয়ার কারণে হতো তা হলে এ প্রসংগে কবরস্থান ও গোসলখানাকে শুধু উল্লেখ না করে ময়লাপূর্ণ বন-জঙ্গল ও কসাইখানার কথা উল্লেখ করাই শ্রেয় ছিল।

চতুর্থতঃ অভিসম্পাত দেয়া ও লানত করার সময় রাসূল(সঃ) কবরকে মাসজিদে পরিণত কারীদের পাশাপাশি কবরে প্রদীপ প্রজ্জলিত কারীদের কথা ও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ উভয় প্রকারের লোকেরাই কবীরা গুনাহের সমান অংশীদার। এটা জানার বিষয়; কবরে প্রদীপ প্রজ্জলিত কারীদের প্রতি লানত এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, তারা কবরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে সম্মান প্রদর্শণ করে। তারা নেচে প্রদক্ষিণ করে কবরকে

এমনি ধরনের মূর্তিতে পরিণত করে। কবরকে মসজিদে পরিণত কারীদেরও ঠিক ঐ একই উদ্দেশ্য থাকে। তারা কবরবাসীকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে সম্মান প্রর্দশন করে। এর মাধ্যমে ফিৎনা ছড়ানোর চেষ্টা করে। সুতরাং এদিকদিয়ে উভয় প্রকারের লোকদের মধ্যে ওৎপ্রোত সাদৃশ্য রয়েছে। (অতএব এখানে কবরের লাশ বাহির হয়ে পড়ার বাহানা মূল্যহীন)।

পঞ্চমতঃ রাসূল(সঃ) বলেছেন--

اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ،

"হে আল্লাহ ! আমার কবরকে পূজার মূর্তিতে পরিণত করো না। আল্লাহ ঐ কওমের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত যারা তাদের নবীদের কবর সমুহকে মসজিদে পরিণত করেছে।"

এখানে রাসূল(সঃ) তাঁর দোয়া "হে আল্লাহ আমার কবরকে পূজার মূর্তিতে পরিণত করোনা" এর পরেই এই কথা উল্লেখ করেছেন যে- "আল্লাহ ঐ কওমের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত যারা তাদের নবী(আঃ) দের কবর সমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।" – এ দ্বারা তাদের প্রতি লানত ও

অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করে সবাইকে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। বাস্তবে এ হুশিয়ারীর কারণ এটাই যে, নবীদের কবর সমূহকে মসজিদে রূপান্তর করার মাধ্যমেই এগুলো পূজার আস্তানায় পরিণত হয়।

ষষ্ঠতঃ কবরস্থানে নামায আদায়ের মধ্যে শিরকের সম্ভাবনা অত্যধিক। এর মধ্য পূর্ববর্তী উম্মতদের মত তাদের সাধু-সজ্জন পূর্বসূরীদের অতিরঞ্জিত শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে সম্মান প্রদর্শনের প্রবনতা রয়েছে ঢের। আছর ও ফজরের পরের সময় মুশরিকরা সূর্য পূজা করে ঠিকই কিন্তু কেউ যদি এসময়ে নামায আদায় করে তাহলে তার মনে এ সূর্যপূজার শিরকি ভাব সামান্যতম উদয় হওয়াও অকল্পনীয়। তবু এই চিন্তা উদয় হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে রাসূল(সঃ) এ সময় নামায আদায় নিষিদ্ধ করেছেন। এর চেয়ে কবরে শিরকি ফিতনার সম্ভাবনা বেশী বলবৎ; তার পরেও তিনি সেটিকে কি ভাবে উপেক্ষা করেছেন বলে ধারণা করা যেতে পারে? বস্তুতঃ পঁচা গলা লাশ বের হয়ে পড়ার কারণে এস্থানে নামায আদায়কে নিষেধ করা হয়নি। বরং

তার কারণ হলো- এখানে নামাযী ব্যক্তি কবরবাসী মৃতব্যক্তিকে ডাকে, তার কাছে নিজের প্রয়োজন মিটানোর দাবী জানায়। এ স্থানে নামাযের মর্যাদা বেশী এ বিশ্বাসে সেখানে শিরক করে। বস্তুতঃ এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সঃ) এর মতাদর্শের পরিপন্থী।

মূল কথা - যিনি শিরক, শিরকের কারণ ও শিরকের মাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন; রাসূল(সঃ) বর্ণিত হাদীস সমূহে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা ভাল করে উপলব্ধি করেন, তিনি কখনো রাসূল(সঃ) এর উক্তি সমূহকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পারেন না। তিনি অবশ্যই মেনে নেন যে, রাসূল(সঃ) এর পক্ষ থেকে নিষেধ করা ও অভিসম্পাত দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি যে শব্দ প্রয়োগ করেছেন 'কক্ষনো করবেনা' ও "নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি" তা কবর থেকে লাশের ধ্বংসাবশেষ বাহিরে বের হয়ে পড়ার কারণে নয়। বরং যারা আল্লাহর বিরোধী; আল্লাহর নিষেধকৃত কাজের ধারক; আত্মপূজায় মগ্ন, রবের ভয়ে শংকাহীন, "আল্লাহই একমাত্র ইলাহ" لا إله إلا الله এর শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করে না,

কালিমার এ শিক্ষা লাভ যাদের ভাগ্যে হয় না, তারা যাতে অপবিত্র শিরকের আবর্তে পতিত না হয়, এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে রাসূল(সঃ) সেদিকেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেননা রাসূল(সঃ) ও অন্যান্য নবী(আঃ) দের কাজই হচ্ছে তাওহীদ ও একেশ্বরবাদকে পাহারা দেয়া। শির্ক তার ধারে কাছে যাতে না আসতে পারে,তার চেষ্টা করা। শিরক যাতে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা, তাদের আরো কাজ হচ্ছে - এ সমস্ত শিরক সমূহকে উৎপাটন করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু অনেকেই তাদের নির্দেশ না মেনে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, পা বাড়িয়েছে নিষিদ্ধ পথে। শয়তান তাদেরকে ঠেলে দিয়েছে ধোকার মধ্যে। অতঃপর তারা তাদের মধ্যকার সাধু-সজ্জন ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের কবরকে বিরাট কিছু জ্ঞান করে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করেছে।

আল্লাহর শপথ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসর প্রভৃতি মূর্তি সমূহের পূজকরা যারা অতীতে ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে, তারা সকলেই বিশেষ করে শয়তানের এ ভ্রান্ত পথে প্রবেশ করেছে

বা প্রবেশ করতে থাকবে। কেননা তারা উক্ত সাধু-সজ্জনদের প্রসংগে যেমন অতিরঞ্জন করেছে, তেমনি তাদের চলার পথকেও ঘোলাটে করে ছেড়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাওহীদ পন্থীদের হিদায়াত দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী সাধু-সজ্জনদের পথেই চলেছেন। উক্ত সাধু-সজ্জনদেরকে আল্লাহ যে নিজের দাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁরাও তাঁদেরকে সেই মানেই বিচার করেছেন। রব্বের বৈশিষ্ট্যে তাঁদেরকে গুণান্বিত করেননি। সত্যিকার অর্থে এটিই হচ্ছে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উত্তম সীমা ও তাঁদের অনুসরণের সঠিক পথ।

* * * *

(কবরে নিষিদ্ধ কাজ কবরবাসীর মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখে)

যাকে আল্লাহ্ সঠিক পথের দিশা দিয়ে অনুকম্পা দেখিয়েছেন বিদ্য়াত ও গোমরাহ পন্থীদের মতো তাঁরএই চিন্তা করা ঠিক নয় যে, কবরকে মূর্তিতে পরিণত নিষেধ করে উক্ত কবর বাসীদের মর্যাদাকে খাটো করা হয়েছে। তাঁর এটা ভাবা উচিত নয় যে,কবরস্থানে নামায আদায় করা,কবরে মসজিদ তৈরী ও বাতি জ্বালানোর ব্যাপারে এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এই সকল কবর বাসীর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। কক্ষনো নয়। বরং এই নিষেধাজ্ঞা তাদের মর্যাদা, সম্মান, আদব প্রদর্শন ও কবর বাসীরা যে আচরণে খুশী হন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এর মাধ্যমেই তাঁরা যে আচরণ অপছন্দ করেন, তাথেকে দূরে থাকা সম্ভব। আর আল্লাহর শপথ ! তুমি তো কবর বাসীর বন্ধু ও হিতাকাঙখী। তাদের রেখে যাওয়া পথের পথিক ও পদাংক অনুসরণকারী, (সুতরাং তাদের চাওয়াকে রূপদেয়াই তোমার কর্তব্য।)

ঐ সমস্ত পথভ্রষ্ট বিদ্‌য়াত কারীরা বরং তাদের মর্যাদাকে সম্মানের নামে খাটো করে ফেলেছে। যেমন খৃষ্টানরা হযরত ঈসা(আঃ) ইয়াহুদীরা হযরত মূসা(আঃ), রাফিদীরা হযরত আলী(রাঃ) এর পথ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। ঠিক তেমনি তারাও তাদের পূর্ববর্তী সাধু-সজ্জনদের পথকে বহু দূরে রেখে এসেছে। বস্তুতঃ সত্য পন্থীরা সত্য পন্থীদের হক ও অধিকার সম্পর্কে বাতিল পন্থীদের চেয়ে বেশী সচেতন। কারণ মুমিনেরা পরস্পরের বন্ধু। মুনাফিকরা ও পরস্পরের ঠিক অনুরূপ। কেননা যখন আত্মা বিদ্‌য়াত দ্বারা আচ্ছাদিত হয় তখন সে সুন্নত থেকে অবশ্যই বিমুখ হয়। যেমন বাতিল পন্থীদের বেলায় ঘটেছে।

এ জন্য দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত কবর পূজকরা সুন্নতের অনুসারী ও সুন্নতের উজ্জীবন কারীদের থেকে ভিন্ন মতের। সুন্নতের অনুসারী ও উজ্জীবন কারীরা যে নির্দেশ দেন বা তারা যেদিকে আহবান জানান ওরা তাথেকে ভিন্ন মুখী।

বাস্তবে নবী(আঃ) ও সাধু-সজ্জনদেরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে সম্মান প্রদর্শণ করার সঠিক পন্থা হচ্ছে

তাঁরা যে পথে আহবান জানিয়েছেন, সে পথে অনুসরণ করা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ- লাভজনক বিদ্যার্জন(দ্বীনি ইলম) করা, সৎকাজ করা, তাঁদের পদাংককে যথেষ্ট মনে করা, তাদের কবর পূজা না করে তাদের কবরে অবস্থান থেকে বিরত থেকে,তাদের কবরকে প্রতিমায় রূপান্তরিত না করে, তাঁদের আচরণ অনুসরণ করা। কেননা যারা তাদের পদাংককে যথেষ্ট মনে করবে এবং সে পথে চলবে, সেই পথের দিকে মানুষদের আহবান জানাবে। এদ্বারা তারা নিজে ও উক্ত কবরবাসী নবী(আঃ) ও সাধু-সজ্জনরা প্রচুর পূন্য লাভ করে থাকেন। পক্ষান্তরে তাদের আহবানের বিপরীতে কাজ করলে, তাদের অপছন্দনীয় কার্যাদী নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সে নিজেও ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলো এবং কবর বাসীরাও এ থেকে মাহরূম হলেন। সুতরাং এ দ্বারা তাদের প্রতি কি ধরনের সম্মান প্রদর্শন করা হলো আমরা মনে করতে পারি ?

* * * *

(প্রতিকৃতি মিটিয়ে দেয়া ও উঁচু কবর সমতল করার নির্দেশ)

কবর ফিতনার নিকটবর্তী হওয়া যে নিষিদ্ধ এ সম্পর্কে রাসূল(সঃ) এর পক্ষ থেকে যে বর্ণনা এসেছে তম্মধ্যে এটিও যে- রাসূল(সঃ) কবরকে উঁচু না করে সমান রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي أنه قال - قال لي علي بن طالب- رضي الله عنه- الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أن لاتدع تمثالا إلا طمسته ولاقبرا مشرفاإلاسويته .

"যেমন ইমাম মুসলিম(রাহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে আবুল হাইয়াজ আল আসাদী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- একদা হযরত আলী বিন আবী তালিব(রাঃ) আমাকে বল্লেন - 'আমি কি তোমাকে একটি কাজ করতে পাঠাব না যে কাজ করতে স্বয়ং রাসূল(সঃ) আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? তা হচ্ছে, যে কোন প্রতিকৃতি পাবে তা মিটিয়ে দিবে, এবং যে কোন উঁচু কবর পাবে সমতল করে দিবে।' "

এ বিষয় অন্যতম বর্ণনা এটি যে - রাসূল(সঃ) তাঁর নিজের কবরকে ঈদের স্থান(১) বানাতে নিষেধ করেছেন।

كما ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريره رضي الله عنه أنه عليه السلام قال - لاتجعلوا قبرى عيدا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم .

"যেমন হাসান সনদ দ্বারা আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে- নিশ্চয় রাসূল(সঃ) বলেছেন- ' তোমরা তোমাদের ঘর গুলোকে কবরস্থানে পরিণত করোনা। (অর্থাৎ তোমরা কবরস্থান মনে করে তাতে নামায আদায় করা একেবারে পরিত্যাগ করো না।) এবং আমার কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করোনা। কেননা তোমরা যেখান থেকেই আমার উপরে দরূদ পাঠাও, তা আমার কাছে পৌঁছে।' "

আবু ইয়ালা মৌছিলী সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আলী বিন হুসাইন(রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে- একদা তিনি এক ব্যাক্তিকে রাসূল(সঃ) এর কবরের

(১) عيد অর্থ উৎসব স্থান বা এমন স্থান যাকে উদ্দেশ্য করে বার বার ভ্রমণ করা হয়।

ঘেরাও এর ছিদ্র দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দোয়া করতে দেখেন। তখন তিনি তাকে এই বলে নিষেধ করলেন-" আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবো না যা আমি আমার পিতা হতে বর্ণনা করছি এবং আমার পিতা আমার দাদা হতে, আমার দাদা রাসূল(সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন? আর এটি হচ্ছে-

قال عليه السلام – لاتتخذوا قبري عيدا ولابيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينماكنتم .

রাসূল(সঃ) বলেছেন- " তোমরা আমার কবরকে উৎসব স্থলে ও তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না। কেননা তোমরা যেখান থেকেই আমার কাছে দরূদ পাঠাও না কেন তা আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।' "

সায়ীদ বিন মানসুর(রোঃ) বলেন সুহাইল বিন আবী সুহাইল হতে আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন যে- একদা হাসান বিন হাসান বিন আলী বিন আবী তালিব(রোঃ) রাসূল(সঃ) এর কবরের নিকট আমাকে দেখেন, অতঃপর তিনি ফাতিমা(রোঃ) এর গৃহে নৈশ ভোজের সময় আমাকে

ডেকে বলেন- এসো এক সাথে রাতের খানা গ্রহন করি। আমি অনাগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন- "তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে রাসূল(সঃ) এর কবরের নিকট দেখলাম।" আমি বললাম যে আমি রাসূল(সঃ) কে সালাম জানাচ্ছিলাম। তিনি বললেন " এই জন্যই কি তুমি মসজিদে প্রবেশ করেছিলে ?"

অতঃপর তিনি বললেন-

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- لاتتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثماكنتم .

নিশ্চয় রাসূল(সঃ) বলেছেন- "আমার ঘরকে তোমরা উৎসব বা পূণঃ পূণঃ যিয়ারতের উদ্দেশ্যস্থলে পরিণত করো না। তোমাদের ঘরগুলোকেও কবর বানিও না। আমার উপরে দরূদ পাঠাও। তোমরা যেখান থেকেই দরূদ পাঠাও তা আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়।"

(হাসান বিন হাসান বলেন) এখানে রাসূল(সঃ) তোমার এখানে অবস্থান বা স্পেনে

অবস্থান উভয়কেই এ বিষয়ে একই দূরত্বের বলে বুঝাতে চেয়েছেন।

রাসূল(সঃ) এর কবর নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কবর। সকল কবরের শিরোমণি। তারপর ও যদি রাসূল(সঃ) এই কবরকে উৎসব কেন্দ্র বা পূণঃ পূণঃ যিয়ারতের উদ্দেশ্য স্থল বানাতে নিষেধ করে থাকেন, তাহলে অন্যান্য সাধারণ কবরের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা অত্যাধিক বলবৎ নয় কি? উল্লেখিত হাদীস সমূহে রাসূল(সঃ) এর নিষেধাজ্ঞার ভাষা ছিল-.ولا تتخذوا بيوتكم قبورا

"এবং তোমাদের ঘর সমূহকে কবরে পরিণত করোনা।"

এ দ্বারা তিনি বাড়ীতে বেশী বেশী নফল নামায আদায়ের প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। যাতে করে ঘর আবার নামায আদায়ের জন্য হারাম স্থল কবরের মত না হয়ে পড়ে। এখানে কবরে নামায আদায় না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ও ইংগিত পাওয়া যায়।

তিনি সব শেষে বলেছেন-

وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم

"এবং তোমরা আমার উপরে দরূদ পাঠ করো কেননা তোমরা দরূদ যে স্থান হতেই পাঠ কর না কেন, তা আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়।"

এ দ্বারা তিনি নিকট কিংবা দূর উভয় স্থান হতে দরূদ পাঠ যে একই মানের, সেদিকে ইংগিত দিয়েছেন। সুতরাং কবরকে মুশরিকদের মত উৎসবস্থল বানানোর কোন প্রয়োজন নেই। আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা মুশরিক তারা তাদের নবী ও সাধু-সজ্জনদের কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করেছিল। ইসলাম পূর্বকালে তাদের কবর গুলোতে নির্দিষ্ট মৌসুমে উৎসব পালন ছিল তাদের ঈদসমূহের মধ্যে অন্যতম। তাদের ঈদ ছিল সময় ও স্থান ভিত্তিক। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাব হলো। আল্লাহ তাদের সময় ভিত্তিক ঈদকে পরিবর্তন করে ঈদুল ফিতর ও মিনায় হাজীদের অবস্থানের দিন গুলোতে ঈদুল আযহার প্রবর্তন করলেন। আর স্থান ভিত্তিক ঈদকে পরিবর্তন করলেন ক্বাবা শরীফ, আরাফাত, মিনা ও মুযদালিফাতে।

* * * *

(বর্ণীত হাদীস সমূহের অপব্যাখ্যা ও তার প্রতি উত্তর)

ইবনুল কাইয়িম(রাহঃ) তার 'ইগাছা' গ্রন্থে বলেন- যারা শিরকের ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের ও কুরআন হাদীস বিকৃতিতে ইয়াহুদীদের ভাবশিষ্য, তারাই এই হাদীস সমূহের অর্থ বিকৃত করেছে। তারা বলে " এই হাদীস সমূহে রাসূল (সঃ) এর কবরে বছরে এক বা দুইবার উৎসব পালনের জন্য গমনকে নিষেধ করা হয়েছে। সবসময় তাঁর কবরে অবস্থান ও পূণঃপূনঃ তাঁর উদ্দেশ্যে সেখানে গমন ও সেখানে বার বার হাজিরা দিতে নিষেধ করা হয়নি।" রাসূল (সঃ) তাদের যেন এমনটি বলতে চেয়েছেন- " ঈদ যেমন বছরে মাত্র দুই দুইবার করে আসে তোমরাও আমার কবরে এরূপ কম কম এসোনা। বরং প্রতিটি মূহর্তে- সর্বসময়েই এখানে অবস্থান কর। এখানে আসার উদ্যেশ্যকে সামনে রাখ।"এদের এ বিকৃত অর্থ রাসূল (সঃ) যা বুঝাতে চেয়েছেন তার বিপরীত। সত্যের পরিপন্থী। এটি রাসূল(সঃ) সত্য গোপন করতেন ও নিজেকে নিজে মহান ভাবতেন- এই মিথ্যা

অপবাদকে জোরদার করে। কেননা সন্দেহ নেই যে, রাসূল(সঃ) তাঁর উক্তি " আমার কবরকে ঈদের স্থলে পরিণত করো না"- দ্বারা যদি সবসময় কবরে অবস্থান ও বেশী বেশী সেখানে আনা-গোনাকে বুঝায়ে থাকেন, তাহলে এর দ্বারা তিনি সত্যকে স্পষ্ট করে না বলারই প্রশ্রয় নিয়েছেন এবং সরাসরি উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত না করে অস্পষ্ট অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। আর এগুলো রাসূল (সঃ) এর মত ব্যক্তিত্বের অপূর্ণতার প্রমান বহন করে; যা গ্রহন যোগ্য নয়। যদি আমরা এটিকে অপূর্ণতা বলে না বুঝি তাহলে আমরা কোনটিকে অপূর্ণ বুঝব? সন্দেহ নেই যে, শিরকের কবীরা গুনাহের সাজা ব্যতীত অন্য পাপে লিপ্ত হওয়ার সাজা রাসূল (সঃ) এর দ্বীন ও সুন্নাতকে বিকৃত কারীদের চেয়ে অনেক কম। বস্তুতঃ এভাবে রাসূল(আঃ) দের দ্বীন পরিবর্তিত হয়েছে।

যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ দ্বীনের পরিশুদ্ধি কারীদেরকে এবং দ্বীনের শুভাকাংখী ও সাহায্যকারীদেরকে প্রতিষ্ঠা না করতেন, তবে এই

দ্বীনের ও এ রূপ অবস্থা হতো যা অন্যান্য দ্বীনের হয়েছে। রাসূল(সঃ) বলেছেন–

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله[১] ، ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

"এই দ্বীনি বিদ্যা একের পর এক সচ্চরিত্রবান ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিগন বহন ও সংরক্ষন করবেন। তারা অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের লিপি ও বিদ্যাচৌর্যবৃত্তি, অন্যের পরিশ্রম লব্ধ লেখা বা বিদ্যার্জনকে নিজের বা নিজের কথা বা লেখাকে অন্যের বলে দাবী ও মূর্খদের অপব্যাখ্যাকে প্রতিহত করবেন।"এখানে রাসূল (সঃ) বুঝাতে চেয়েছেন যে- অতিরঞ্জনকারীরা তাদের কাছে যা এসেছে, তা বিকৃতি করে। বাতিল পন্থীরা রাসূল (সঃ) যা করতেন না, তা করতেন বলে দাবী করে ও মূর্খরা ভুল ব্যাখ্যা দেয়।

এই তিনটি সম্প্রদায়ই ইসলামে ফাসাদ সৃষ্টিকারী।

(১) ইসলামী বিদ্যার পরিভাষায় আদল(عدل) বলতে বুঝানো হয়েছে أن يكون مسلما ، بالغا، عاقلا ، سالما من من أسباب الفسق و خوارم المروءة . অর্থাৎ- মুসলমান, সাবালগ, বোধশক্তি সম্পন্ন এবং ফাসেকী রুচি বিকৃতির কারণ সমূহ হতে মুক্ত ব্যক্তি।

এই সমস্ত পথভ্রষ্ঠ কারীরা যা বলে রাসূল (সঃ) যদি তাই পছন্দ করতেন তাহলে নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করতেন না। এ কাজ যারা করে তাদেরকে লানত করতেন না। কিন্তু তিনিই তো কবরস্থানে আল্লাহর ইবাদত কারীকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। এরপর তিনি কেমন করে কবরের পেছনে লেগে থাকতে নির্দেশ দিলেন? কেমন করে অনুমতি দিলেন সেখানে অবস্থান করতে? বছরের নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত ঈদের উৎসবের মতো না করে সদা সর্বদা সেখানে যাতায়াত করতে কিভাবে তিনি হুকুম দিলেন? তিনি যদি " আমার কবরকে ঈদের স্থলে পরিণত করো না" দ্বারা সদা সর্বদা সেখানে অবস্থানকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে সাথে সাথে কিভাবে আবার বললেন যে, " আমার প্রতি দরূদ পড়, কেননা তোমরা যেখান থেকেই তা পড়না কেন, আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।" শিরক ও বিকৃত অর্থের ধারক উক্ত পথ ভ্রষ্টরা যা বুঝেছে, কেমন করে সাহাবী(রোঃ) ও আহলি বাইতের লোকেরা তা বুঝলেন না?

আহলি বাইতের মধ্যে অন্যতম তাবেয়ী আলী বিন হুসাইন(রাহঃ)। পাঠকরা অবশ্যই পূর্বে জেনেছেন যে, তিনি যে ব্যক্তি রাসূল(সঃ) এর কবরে দোয়ায় বাড়াবাড়ি করে ছিলেন তাকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেন। যে প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁর পিতা হতে ও তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ হতে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দলীল হিসাবে উপস্থাপন ও করেছিলেন। পক্ষান্তরে তিনি তো নিঃসন্দেহে ধর্মদ্রোহী বিদয়াত পন্থীদের চেয়ে বড় আলিম। তাঁর চাচাত ভাই হাসান বিন হুসাইন(রাহঃ) আহলি বাইতের অন্যতম শাইখ ছিলেন। তিনিও মসজিদের নববী(সঃ) এর উদ্দেশ্য না গিয়ে কবরের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করাকে অপছন্দ করেছেন। আর এ কাজকে তিনি মনে করতেন - বার বার কবরের উদ্দেশ্যে আগমন। তিনি এ থেকে সবাইকে নিষেধও করেছেন।

হযরত ইবনি কাইয়িম (রাহঃ) তাঁর 'ইগাছা' গ্রন্থে তাঁর শাইখ হতে বর্ননা করেন যে, সুন্নাতের দিকে দৃষ্টি দিন। রাসূল (সঃ) এর নিকট-বংশ ও নিকট প্রতিবেশী মদীনার বাসিন্দা ও আহলি বাইতরা এ বিষয়ে যা করেন, তা অনুসরণ করুন। এ

বিষয়ে তাঁরাই তো সকলের চেয়ে অনুসরণ যোগ্য। তাঁরাই ছিল এটার শক্ত অনুসারী।

* * * *

(কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করার অশুভ পরিণতি)

কবরকে উৎসব স্থল বা অবিরত আনা-গোনার উদ্দেশ্য স্থলে পরিণত করা বিরাট অনিষ্টতা ও ফাসাদের অর্ন্তভূক্ত, যার পরিণতি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এ জন্য যার হৃদয় আল্লাহর মর্যাদা অনুধাবন করেছে, যিনি একত্ববাদের একনিষ্ঠ অনুসারী, যিনি শিরককে ঘৃণা করেন, কুফরী ও বিদয়াতকে তিরস্কার করেন, একাজকে তাদের সকলেরই অপছন্দ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু মরার পরে খরগের ঘায় কিছুই লাভ হয় না।

কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করলে যে সমস্ত বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে অন্যতম যে, কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করার বিষয়ে অতিরঞ্জন কারীরা দূর থেকে কবর দেখেই তাদের বাহন থেকে নেমে পড়ে। চেহারা মাটিতে লাগায়, মাথা কাপড়মুক্ত করে, কবরের দিকে চুমু নিক্ষেপ করে। কবর বাসীকে ডাকতে থাকে। তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে প্রয়াস পায়, যার সৃষ্টির

ক্ষমতাও নেই পূণরুত্থানের সামর্থও নেই। উচ্চ বাক্য করে শুধু শোরগোল করতে থাকে। এখানে উপস্থিত হয়ে হাজীদের চেয়ে লাভবান হয়েছে বলে মনে করে। এমনকি নির্দিষ্ট কবরে যখন পৌছায় দু'রাকাত নামায আদায় করে। এই নামায দ্বারা যারা কাবা ও কুদস্ উভয় কিবলাতে নামায আদায় করেছেন তাদের চেয়ে বেশী ছাওয়াব অর্জন করেছে বলে মনে করে। আপনারা তাদেরকে কবরের আশে-পাশে সিজদাহ অবস্থায় কবরবাসী মৃতব্যক্তির কাছে করুণা কামনা করতে দেখবেন। বস্তুতঃ এ দ্বারা তারা অঞ্জলী ভরে নিরাশা ও ক্ষতি অর্জন করল। আল্লাহর জন্যতো নয়ই, বরং শয়তানের জন্য অশ্রু বিসর্জন দিল। উচ্চ বাচ্য করল। মৃতের কাছে প্রয়োজন মিটানোর আহবান জানালো। বিপদ মুক্তি কামনা করল,দরিদ্রদের জন্য ধন এবং অসুস্থদের জন্য সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করল।

অতঃপর তারা এমন ভাবে কবরের চারিপার্শ্বে দলে দলে তওয়াফ করে, যেন এটি ঐ ক্বাবা তুল্য যাকে আল্লাহ বরকত দান করেছেন ও সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়াতের উৎস বানিয়েছেন।

এরপর মসজিদে হারামের ' হাজরে আসওয়াদ ' বা কালো পাথরের ন্যায় তারা কবরে চুমু খেতে থাকে ও হাত দ্বারা স্পর্শ করতে থাকে। অতঃপর তাদের চেহারা ও কপাল মাটিতে অবনত করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই জানেন যে, তারা তাঁকে সিজদা করার সময়, এত আন্তরিক কখনো হয় না। তারা তাদের চুল ছেটে বা মুন করে কবরেই হজ্জ পরিপূর্ণ করে থাকে। স্রষ্টার কাছে মূল্যহীন এই প্রতিমা পূজার মাধ্যমে তারা আনন্দ কুড়ায়। তাঁর নামে কুরবাণী আদায় করে। তাদের নামায, তাদের কুরবাণী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে উৎসর্গ করে। অবশেষে আমরা তাদেরকে এই বলে পরস্পরে মুবারকবাদ বিনিময় করতে দেখি যে- 'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ ছাওয়াব দান করুন।' যখন তারা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে তখন পথভ্রষ্ট কিছু লোক যারা কবরে উপস্থিত হতে পারেনি তারা তাদের কবর কেন্দ্রিক এই হজ্জের ছাওয়াব নিজেদের বাইতুল্লার হজ্জের পরিবর্তে ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে। তখন কবরের হাজীরা বলে- "কক্ষনো নয়, তোমার

বাইতুল্লাহ কেন্দ্রিক প্রতি বছরের হজ্জের বিনিময়ও এ ছাওয়াব বিক্রয় যোগ্য নহে।" আমরা ঘটনাবলী উল্লেখ করতে যেয়ে অতিরঞ্জন কিছু করিনি। তারা কল্পনাতীত যে সমস্ত গোমরাহী ও বিদায়াতের প্রবর্তক যেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও করা সম্ভব হয়নি। যারা ইলম ও ফিকাহের সামান্য সুগন্ধ লাভ করেছে, তারা অবশ্যই জানে যে, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই ঘৃণিত কাজের জঘন্য মাধ্যম গুলো ধ্বংস করা। শরীয়ত প্রবর্তকতো অবশ্যই জানেন, যারা তাঁর এ নিষেধাজ্ঞাকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করছে, তাদের পরিণতি কি। তিনি আরো জানেন তাঁরই অনুসরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই হিদায়াত ও কল্যান এবং তার বিরোধিতা ও পাপকাজে রয়েছে অমঙ্গল ও গোমরাহী।

রাসূল (সঃ) কবর সম্পর্কিত হাদীস সমূহ রেখে গেছেন। সাহাবী (রাঃ) ও তাবিয়ী গন (রাহঃ) এবিষয়ে অনুসরণ করেছেন সঠিক পথ। এই হাদীস সমূহ ও তাদের সঠিক অনুসরণকে যদি এক পাল্লায় দিয়ে এ যুগে যারা কবর কেন্দ্রিক কর্মকাে লিপ্ত তাদেরকে ভিন্ন পাল্লায় দেয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে

ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, এ যুগের এরা পূর্ব সূরীদের একেবারেই বিপরীত মুখী। কেননা রাসূল (সঃ) কবরে নামায আদায় নিষেধ করেছেন, তারা কবরে নামায আদায় করে। রাসূল (সঃ) কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন, তারা এর বিরোধিতা করে কবরে মসজিদ বানায়। একে প্রদর্শনীর বস্তু হিসেবে প্রচার করে। তিনি (সঃ) কবরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন, তারা এর উপর ধূপবাতি, মোমবাতি জ্বালায় বরং এগুলোকে কবরের নামে ওয়াকফ করে। রাসূল (সঃ) কবরের উপরে মাটি উঁচু করে দিতে বারণ করেছেন, তারা এর উপরে বাড়ীর মতো উঁচু করে মাটির টিলা তৈরী করে। রাসূল (সঃ) কবর পাকা ও কোন কিছু তার উপরে বানাতে নিষেধ করেছেন, তারা কবর পাকা করে। তার উপরে গম্বুজ তৈরী করে। তিনি (সঃ) কবরের উপরে কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন, তারা তার উপরে সাইনবোর্ড লাগায়। তার উপরে কুরআন ও অন্যান্য বহু কিছু লিখে। রাসূল (সঃ) কবর খনিত মাটি ছাড়া এর উপরে অন্য কিছু দিতে নিষেধ করেছেন, তারা এটা না মেনে তার উপর অতিরিক্ত

মাটি, পোড়া ইট; পাথর দিয়ে থাকে। উপরে ছাদ নির্মান করে রাসূল(সঃ) কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন, তারা এখানে সমবেত হয়ে , এটাকে উৎসব স্থলে পরিণত করে। মূল কথা তারা রাসূল(সঃ) এর নিষেধাজ্ঞা ও নির্দেশিত হাদীস সমূহের পরিপন্থী রাসূল(সঃ) যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তারা তার বিরোধী।

অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, এই সমস্ত পথ ভ্রষ্ট ও পথ ভ্রষ্ট কারীরা কবরে হজ্জ পালন ও সেখানে হজ্জের নিয়ম নীতিকে শরীয়তে বৈধ দেখানোর মত ধৃষ্টতাও দেখিয়েছে। এমনকি তাদের মধ্যে কিছু কিছু অতিরঞ্জন কারীরা 'কবরস্থানে হজ্জের নিয়ম নীতি' শীর্ষক পুস্তক প্রণয়ন করে কবরকে বাইতুল্লাহর সম আসনে বসাতেও দ্বিধাবোধ করেনি। এটা পরিষ্কার যে, এটা ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী কাজ এবং মূর্তি পূজার ধর্মে প্রবেশের শামিল। পর্যবেক্ষণ করে দেখুন যে রাসূল(সঃ) এর শরীয়ত যা বলে ও তারা যা করে তার মধ্যে কত ব্যবধান। সন্দেহাতীত সত্য যে, তাদের কর্মকাে অসংখ্য বিপর্যয় ও অনিষ্টতা নিহিত রয়েছে। যেমন-

১) স্থান সমূহকে সম্মান প্রদর্শন করা, যা ফিতনাহ সৃষ্টি করে।

২) আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় যে ভূখ, তার চেয়ে অন্য স্থানকে বেশী মর্যাদা দান। কেননা তারা কবরে নরম দিলে বিনয় অবনত চিত্তে সম্মান প্রর্দশনের ইচ্ছা করে, যা তারা মসজিদেতো করেইনা বরং এর সমান বা ধারে কাছের কিছুও করে না। তাদের এ কাজ তারা যে কবর আবাদ কারী ও মসজিদ ধ্বংস কারী, তার প্রমাণ বহন করে। তারা রাসূল (সঃ) এর মাধ্যমে প্রেরিত দ্বীনের পরিপন্থী। রাফিদী(শিয়াহ) সম্প্রদায়ও এদের মতো যেহেতু কবরকে জীবিত ও মসজিদকে ধ্বংস করেছে, সে জন্য ইলম ও দ্বীন থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করছে।

৩) কবরের মাধ্যমে বিপদাপদ দূরিভূত হবে, শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে প্রভৃতি আকাঙখা রাখে।

৪) কবরের কাছে বড় শিরকী কাজ করা, কেননা শিরক হচ্ছে বড় যুলম, সব চেয়ে ঘৃণিত এবং অতি নিকৃষ্ট কাজ। শিরক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে

গর্হিত ও রাগের বস্তু। এ কারণে শিরক কারীর জন্য ইহকাল এবং পরকালে এমন সাজার বিধান তিনি প্রনয়ণ করেছেন যা অন্য কোন পাপের ক্ষেত্রে করেননি। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, শিরকের পাপ ক্ষমা যোগ্য নয়। শিরককারী অপবিত্র। তাদেরকে হারাম শরীফের নিকটবর্তী হতেও তিনি কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তাদের যবেহকৃত পশুর গোস্ত ও তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকেও হারাম করেছেন। তাদের সার্থে মুমিনদের বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন এবং স্বয়ং আল্লাহ নিজের জন্য, ফিরিস্তা, রাসূল(সঃ) ও মুমীনদের জন্য তাদেরকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

একত্ববাদীদের জন্য তাদের সম্পদ-সম্পতি ভোগ এবং তাদের স্ত্রীগণ ও তাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করাকে বৈধ করেছেন। কেননা শিরক আল্লাহর রবুবিয়াতের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ, উলুহিয়াতের মর্যাদায় কুঠারাঘাত হানা ও রাব্বুল আলামীনের প্রতি খারাপ ধারণার নামান্তর। এর কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা

পোষণ করেইতো তার সাথে অন্যকে শরীক করেছে। যদি ভাল ধারণা রাখত তাহলে তাঁর একক একত্ববাদের প্রতি তারা ঈমান আনত। একত্ববাদের পরিপন্থী কোন কিছু তারা অবশ্যই করত না। এদিকে লক্ষ্য করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তিন জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে - যেমন ভাবে আল্লাহকে জানা উচিত ছিল, তেমন ভাবে তারা জানেনি। তারা আল্লাহর সম্পর্কে কি করেই বা জানবে, যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে তাকে ভালবাসে, তাকে ভয় করে, তাথেকে পেতে চায়, তার কাছে বিনয়ী হয়?

সকলেই জানে যে, তারা তাদের মূর্তি ও প্রতিমা গুলোকে আল্লাহর সত্তা, আল্লাহর গুন ও কার্যের একেবারে সমকক্ষ মনে করে না। তারা এটাত বলেনা যে, মূর্তিরাই আকাশ পাতাল সৃষ্টি করেছে। মূর্তিরা মৃত্যু ও জন্মের অধিপতি, তারা তা স্বীকার করে না। তবে তারা ভালবাসায়, সম্মানে ও ইবাদতে এদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। যেমন ইসলামধারী অনেক মুশরিকদেরকে আপনারা এরূপ দেখতে পাবেন।

৫) কবরে মসজিদ তৈরী করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সঃ) এর লানতের তালিকাভূক্ত হওয়া।

৬) তারা কবরকে অবস্থানের স্থান বানিয়ে এর প্রতিবেশী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে, এতে গালিচা বিছিয়ে, এর খাদিম সেজে মূর্তি পূজকের সমমানে পরিণত হয়েছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ হারাম শরীফের খেদমত করা ও এর প্রতিবেশী হওয়ার চেয়ে কবরের খেদমত ও এর প্রতিবেশী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

৭) কবরের উদ্দেশ্যে বা এর রক্ষণাবেক্ষণের কাজে মানত করা।

৮) আল্লাহ ও রাসূল(সঃ) এর দ্বীনের বিরোধিতা করা ও শরীয়তের পরিপন্থী কাজ করা।

৯) সুন্নতের ধ্বংস সাধন ও বিদয়াতের পূণর্জন্ম দান প্রভৃতি তাদের কর্মকাে নিহিত বিপর্যয় ও অনিষ্টতার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * * *

(কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে ভ্রমন বিদয়াত)

১০) ফাসাদ ও অনিষ্ঠতা নিহিত তাদের কর্মকারে মধ্যে এটিও একটি যে, প্রচ কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে গুনাহ অর্জন করে কবরের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করা। কেননা সকল আলিমরা এক মত যে, কোন নবী(সঃ) বা কোন সাধু-সজ্জনদের কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা বিদয়াত। সাহাবীরা(রাঃ) ও তাবেয়ী(রাহঃ)দের কেউ এমনটি করেননি। স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের রাসূল(সঃ)ও এরূপ নির্দেশ দেননি। মুসলমানদের কোন ইমাম এটাকে ভাল বলে গ্রহণ করেননি। এতদসত্ত্বেও যে এটাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বা এটাকে তারই আনুগত্য বলে বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই হাদীস ও ইজমার বিরোধী কাজই করে। সকল মুসলমানদের ঐক্যমত বা ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, উপরোল্লেখিত বিশ্বাস করে কোন কবরের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করা হারাম। কবর বাসীর নৈকট্য লাভ কামনার জন্য এটাকে হারাম করা হয়েছে। এটাও

স্বতসিদ্ধ যে, স্বাভাবিক ভাবে এই উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন কবরের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করেনা।

وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه السلام قال- لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ،المسجد الحرام و المسجد الأقصى ومسجدي هذا .

দুই ছহীহ হাদীস গ্রন্থে (বুখারী ও মুসলিম) উদ্ধৃত হয়েছে যে, নিশ্চয় রাসূল(সঃ) বলেছেন -"তোমরা তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্য ছাড়া (পূন্য লাভের আশায়) আর কোথাও ভ্রমন করবেনা। আর সে তিনটি মসজিদ হল মসজিদুল হারাম , মসজিদুল আকসা ও আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)।"

১১) অনিষ্টতার মধ্যে এটিও যে, কবর বাসীকে কষ্টদান করা। কেননা কবর বাসীরা তাদের প্রতি পূর্বোল্লেখিত আচরণের জন্য কষ্ট পেয়ে থাকেন। তারা এ আচরণকে কঠোর ভাবে ঘৃণা করেন। যেমন ঈসা(আঃ) তাঁর প্রতি খৃষ্টানদের আচরণকে ঘৃণা করেন। তিনি ছাড়াও অন্যান্য মৃত নবী(আঃ), আলিম ও দ্বীনের পণ্ডিতেরা তাঁদের প্রতি খৃষ্টানদের সমমানের আচরণের জন্যও কষ্ট পেয়ে থাকেন। তাঁরা কিয়ামতের দিন এই ইসলাম বিরোধী

আচরণের দায় দায়িত্ব আচরণ কারীদের ঘাড়েই চাপাবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন----

يوم يحشرهم و مايعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هولاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم و أباءهم حتى نسوا الذكر و كانوا قوما بورا .

"সেই দিন আল্লাহ তাদেরকে এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন- 'তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে? - না তারা নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট হয়েছিল?' তারা বলবে- আপনি পবিত্র, আপনাকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক বানানোর অধিকারতো আমাদের ছিলনা। বরং আপনি তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ দান করেছিলেন এরপর তারা আপনাকে ভুলে গিয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংস প্রাপ্ত জাতি।" (ফুরকান ১৭-১৮)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

واذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ، قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي بحق ،

"এবং আল্লাহ যখন বলিবেন, হে ঈছা বিন মারিয়ম! তুমি কি মানুষদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে দুই ইলাহ হিসেবে গ্রহন কর? তিনি বলবেন- আপনি এসব থেকে পবিত্র। এরূপ যে কথা বলার আমার অধিকার নেই, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। (মায়িদা - ১১৬)

* রাসূল(সঃ) এর পক্ষ থেকে কবর যিয়ারতকে বৈধ করার উদ্দেশ্য ছিল পরকালকে স্মরণ ও ঐ থেকে উপদেশ লাভ করা। কবর বাসীর অবস্থা থেকে নছীহত গ্রহণ। কবর বাসীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও অনুকম্পা দেখাতে শেখানো। এই যিয়ারতের মাধ্যমে যিয়ারত কারী নিজের প্রতি ও মৃত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র ও সমবেদনা প্রদর্শনের শিক্ষাদান। কিন্তু পথভ্রষ্টরা এটাকে পরিবর্তন করেছে। দ্বীনের এই রীতি-নীতি কে বিপরীত মুখে ঠেলে দিয়েছে। যিয়ারতের উদ্দেশ্যকে শিরকে

রূপান্তরিত করেছে। কবর বাসীর কাছে দোয়া করেছে। প্রয়োজন মিটানোর আবেদন করেছে। বরকত অবতীর্ণের জন্য আবদার জানিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ দ্বারা নিজ ও মৃতব্যক্তি উভয়কেই অমঙ্গলের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ জন্যই রাসূল(সঃ) ইসলামের প্রথম যুগে কবর যিয়ারতকে নিষেধ করেছিলেন। কেননা তারা ছিল কুফরী পরিত্যাগ করে সদ্য ইসলাম গ্রহন কারী। অতঃপর তাদের মনে তাওহীদ ও একাত্ববাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। তখন তাদেরকে তিনি কবর যিয়ারতের অনুমতি দিলেন। এর উপকার বিশ্লেষণ করলেন। কখনো বা নিজের কর্মে কখন বা কথাবার্তায় এর পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন বহু হাদীস গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যে হাদীস গুলোতে কবর যিয়ারতের অনুমতি আছে, যে গুলোতে এর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেখানে এর উপকারীতাও সম্বলিত হয়েছে। এখানে আমি তাথেকে কিছু উল্লেখ করব।

* * * *

(কবর যিয়ারতের অনুমোদিত হাদীস সমূহ)

حديث أبي سعيد أنه عليه السلام قال- إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن ارادا أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا ،، رواه الإمام أحمد و النسائي.

"হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- রাসূল(সঃ) অবশ্যই বলেছেন- 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন যদি কেউ চায় তাহলে সে যিয়ারত করতে পারে। তবে তোমরা সেখানে কোন অবৈধ উক্তি করবে না।" (ইমাম আহমদ ও নাসায়ী)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- زوروا القبور فإنها تذكر الموت . رواه مسلم

আবু হুরায়াইরা(রাঃ) এর হাদীস- নিশ্চয় রাসুল(সঃ) বলেছেন যে, - "তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (মুসলিম)

(শরিয়ত সম্মত কবর যিয়ারতের পদ্ধতি)

حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذاخرجوا إلى المقابر أن يقول -السلام على آهل الديار ،، وفي لفظ مسلم (السلام عليكم يا أل الديار ، من المؤمنين و المسلمين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية).

"সুলাইমান বিন বুরাইদাহ(রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রাসূল(সঃ) তাদেরকে কবর যিয়ারতে যাওয়ার সময় এই বলতে শিক্ষা দিতেন যে-(السلام على أهل الديار) মুসলিম শরীফে এসেছে (أهل الديار) এর স্থলে(آل الديار) যার অর্থ একই।

'হে মুমিন ও মুসলমান কবরবাসীরা তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' "

হযরত আয়িশা(রাঃ) এর হাদীস। তিনি বলেন যখন আমার ঘরে রাসূল(সঃ) এর রাত্রি যাপনের পালা আসত, তখন রাত্রের শেষ অংশে তিনি 'বাকীই' নামক কবরস্থানে গমন করতেন এবং বলতেন-

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وأنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد – رواه مسلم

"হে কবরের মুমিন অধিবাসীরা তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের জন্য যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, নিকটবর্তী সময়েই তা পেয়ে যাবে এবং তা নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে। অপেক্ষা কর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ, বাকীউলগারকাদের অধিবাসীদেরকে আপনি ক্ষমা করুন।" (মুসলিম)

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال – السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر– رواه الإمام أحمد و الترمذي وحسنه .

ইবনি আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস। তিনি বলেন-নিশ্চয় একদা রাসূল (সঃ) মদীনার এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি কবরগুলোকে সামনে নিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন-

السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم و أنتم سلفنا و نحن بالأثر.

"হে কবর বাসীরা তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বপুরুষ আমরা তোমাদের উত্তরসূরী।(আহমদ ও তিরমিযী)। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

কেননা রাসূল (সঃ) এই হাদীস সমূহে বর্ণনা করেছেন যে, কবর যিয়ারতের দ্বারা লাভ হচ্ছে- স্বয়ং যিয়ারতকারী ও মৃতব্যক্তির প্রতি ইহসান ও অনুকম্পা প্রদর্শন। তার ইহসান অর্থ মৃত্যু ও পরকালকে স্মরণ করা, দুনিয়ার চাকচিক্য পরিহার করার শিক্ষা নেয়া ও মৃতব্যক্তির বর্তমান অবস্থা থেকে নছীহত ও উপদেশ গ্রহন করা। অপর পক্ষে মৃতব্যক্তির প্রতি ইহসানের অর্থ হলো-তার প্রতি

সালাম দান করা, তার জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা ও তার জন্য মংগল চাওয়া।

অতঃপর মৃতব্যক্তি যেই হোকনা কেন, ওলী হোক বা অন্য কোন মুমিন হোক, যখন কেউ তাদের কবর যিয়ারত করবে তখন তাদের প্রতি সালাম জানাবে। তাদের জন্য কল্যান চেয়ে দোয়া করবে। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। রহমত কামনা করবে ঐ পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী হাদীস সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর নিজের অবস্থা ও কবর বাসীদের অবস্থা পর্যালোচনা করে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। উপলব্ধি করবে তাদেরকে কি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা তার কি উত্তর দিয়েছে। তাদের কবর কি বেহেশতের বাগিচা না আগুনের গহ্বর? অতঃপর নিজেকে কবর বাসীদের স্থানে নিয়ে কল্পনা করবে যে, সে কবরে লাশ হয়ে প্রবেশ করেছে। তার সম্পত্তি, তার সন্তান সন্ততি, তার-পরিবার-পরিজন তার- জ্ঞান বুদ্ধি তাকে পরিত্যাগ করেছে। সে সেখানে নির্জনে একাই অবস্থান করছে। তাকে এক্ষুনি প্রশ্ন করা হবে, সে কি উত্তর দিবে? তার কি অবস্থা হবে? যিয়ারত কারী যতক্ষন পর্যন্ত সেখানে

অবস্থান করবে প্রতিটি মূহুর্ত থেকে তার উপদেশ গ্রহন করা উচিৎ। পূর্ব বর্ণিত এই সমস্ত জঘন্য বিপদ ও ফিতনা থেকে দূরে অবস্থান করে তার রব্বের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে নিয়োজিত থাকা তার কর্তব্য। তার উচিৎ তার রব্বের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করা।

* * * *

(কবরে কুরআন পাঠ ও তার হুকুম)

কবরে কুরআন পাঠ করাকে কোন কোন আলিম জায়িয (বৈধ) বলেছেন। অপর পক্ষে অন্যরা এটাকে নাজায়িয (অবৈধ) বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন- "যিয়ারতের সময় যিয়ারতকারী অবশ্য উপদেশ অর্জন ও নছিহত গ্রহণে মগ্ন থাকে। আর কুরআনপাঠ কারীকে তার পঠিত অংশ অনুধাবন করার জন্য সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে সেদিকে নিবদ্ধ করতে হয়। একই সময় একই সাথে একজনের পক্ষে এই উভয় প্রকার কাজকে একত্রে করা সম্ভবপর নহে।"

যদি কেউ বলে- "আমি নছিহত গ্রহণ করব একসময় আর কুরআন পাঠ করব অন্য সময়। কারণ হচ্ছে কুরআন পাঠ করলে যেহেতু রহমত বর্ষিত হয় সেহেতু হতে পারে কোন মৃত ব্যক্তি এই রহমত লাভ করবে ও লাভবান হবে।"

বাস্তবে এ বক্তব্যের কয়েক ভাবে উত্তর দেয়া যায়।

প্রথমতঃ হ্যাঁ, কুরআন পাঠ নিঃসন্দেহে ইবাদাত। যিয়ারতকারীর পূর্বোল্লেখিত বিষয় মগ্ন থাকা, মৃত্যু, ফিরিশতা দ্বয়ের প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বিষয় থেকে নছিহত গ্রহণ ও কিন্তু ইবাদাত। যিয়ারত করার সময়টি শেষোক্ত ইবাদাতের জন্যই মাত্র উপযুক্ত। কুরআন পাঠের জন্য নহে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট ইবাদাত বাদ দিয়ে অন্য কোন কারণে অন্য কোন ইবাদাত ঠিক নহে।

দ্বিতীয়তঃ মৃত ব্যক্তির কবরে কুরআন পাঠ হয়তো অহেতুক তার শাস্তির অথবা শাস্তিকে বেশী করার কারণ হতে পারে। কেননা কোন আয়াত পাঠ করা হলে সে যদি তার আলোকে আমল করে না যেয়ে থাকে তখন তাকে বলা হবে- "তুমি কি এটা শুননি? তারপরেও কেন এটাকে আমল করনি?" সুতরাং এদ্বারা পঠিত এই অংশের পরিপন্থী কাজ করার কারণে তাকে বেশী শাস্তি দেয়া হতে পারে। যেমন কেহ কেহ তাদের পরীক্ষামূলক ঘটনার উল্লেখ করতে যেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, একব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো- আপনার কবরে

রাতদিন কুরআন পাঠ করা হলো। আপনি কি তাথেকে কোন লাভবান হন না? তখন তিনি উত্তর দিলেন- এটাই আমার বেশী শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে আমরা প্রসংগটা যে ভাবে আলোচনা করলাম, তিনিও ঠিক এভাবেই বিষয়টি বর্ণনা করলেন।

অবস্থা যদি এমনই হয়, তাহলে যিয়ারতকারীর উচিত, সে যেন সুন্নতকে অনুসরণ করে। শরীয়ত তার জন্য যে করণীয় কাজ নির্ধারণ করেছে, সে যেন সেই অনুযায়ী আমল করে। এবং শারীআতের বিপরিত কর্ম না করে; কেননা তাতেই নিজের আত্মার প্রতি এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি ইহসান বা মঙ্গল করা হবে।

* * * *

(শরীয়ত সম্মত কবর যিয়ারত ও শির্‌কী কবর যিয়ারত)

কবর যিয়ারতের প্রকারভেদ

কবর যিয়ারত দুই প্রকার ঃ-

* শরীয়ত সম্মত যিয়ারত ও

* বিদয়াতী যিয়ারত

শরীয়ত সম্মত যিয়ারত ঃ

যে পদ্ধতিতে রাসূল(সঃ) কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন, সেটাই শরীয়ত সম্মত যিয়ারত। এই যিয়ারতে দুইটি উপকার নিহিত রয়েছে।

প্রথমতঃ যিয়ারত কারীর জন্য উপকার। আর তা হচ্ছে যিয়ারত কারীর যিয়ারত থেকে নছিহত ও উপদেশ গ্রহণ।

দ্বিতীয়তঃ মৃতব্যক্তির জন্য উপকার। আর তা হচ্ছে যিয়ারত কারী তার প্রতি সালাম জানাবে। তার জন্য দোয়া করবে। তাকে ভুলে যাবে না। কেননা জীবিত কারো সাথে যদি অনেক দিন যাবৎ সাক্ষাৎ ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তাকে ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে যদি

কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া হয়, তাহলে তিনি খুশী হন। এই দৃষ্টিকোন থেকে মৃতব্যক্তি অবশ্যই সাক্ষাৎ লাভের দিক থেকে প্রাধান্য পাওয়ারই যোগ্য। কারণ সে তার পরিবার-পরিজন, ভাই-বন্ধু ও জানা পরিচিত ব্যক্তি বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন এক ঘরে অবস্থান করছে। যদি কেউ তাকে যিয়ারত করে ও তার জন্য সালাম-দোয়া উপহার দেয় তাদ্বারা তার খুশী ও আনন্দ বর্ধিত হয়।

বিদয়াতী যিয়ারাতঃ

বিদয়াতী যিয়ারতের অন্তর্ভূক্ত কাজ গুলো হচ্ছে- কবরে নামায আদায় করা। তাওয়াফ করা, চুমু দেয়া, স্পর্শ করা, কপাল ছোয়ানো ও এ থেকে মাটি সংগ্রহ করা। কবর বাসীদের কাছে কিছু চাওয়া। তাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা। তাদের থেকে বিজয়, জীবিকা, সুস্থতা, সন্তান, ঋণ পরিশোধ, বিপদ মুক্ত, চিন্তা দূরীকরন প্রভৃতি কামনা করা। বাস্তবে এই গুলোই মুর্তি পূজকরা তাদের মুর্তির কাছে প্রার্থনা করত। মুসলমান সকল ইমামদের(রোহ্ঃ) সর্ব সম্মত মতে এটা বৈধ নয়। রাসূল(সঃ) কখনো এরূপ করেননি। ছাহাবী(রোঃ) তাবিয়ী(রোহঃ) ও কোন

ইমামদের কেউ পারত পক্ষেও এ কাজে অংশ নেননি। বরং বিদয়াতী এ যিয়ারত কাট্টা শিরক যা মূর্তি পূজকদের কাছ থেকে আমদানি কৃত।

এই শিরকি আদর্শের প্রবর্তকরা বলে- "উত্তম মৃত ব্যক্তির রূহ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর কাছে তার জন্য রয়েছে বিশেষ সম্মান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুকম্পা এবং রহমত ও রূহের প্রতি মঙ্গল বর্ষিত হয়। যদি যিয়ারতকারী মৃত ব্যক্তির এই রূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তার নিকটে পৌঁছাতে সক্ষম হয় তাহলে উক্ত মৃতের রূহ হতে এই রহমত ও অনুকম্পার বিচ্ছুরিত প্রতিফলন তার উপরেও পড়তে থাকে। যেমন পরিস্কার আয়না ও পানির উপর জ্যোতির প্রতিফলন তার মুখোমুখি দাঁড়ানো ব্যক্তির গায়ে পড়ে থাকে।"

অতঃপর তারা আরো বলে যে- "যিয়ারত কারী একাগ্রতার সাথে তার নিজের রূহকে উক্ত কবর বাসীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করাই হচ্ছে পরিপূর্ণ যিয়ারত। তার সকল চিন্তা, সকল ইচ্ছা-আকাঙখা, তার উপস্থিতি একমাত্র এই কবরবাসীর জন্য নির্দিষ্ট

করে দিতে হবে। তার এ একাগ্রতা যাতে কবর ব্যতিত অন্যমুখী না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। তার একাগ্রতা কবর বাসীর দিকে যত গভীর হবে, তা থেকে সে ততবেশী লাভবান হবে।" ইবনে সিনা,ফারাবী ও অন্যান্যরা এবং নক্ষত্র পুজা করা এই শ্রেনীর যিয়ারতের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ এ চিন্তা-ভাবনা নক্ষত্র পূজকদেরই চিন্তা ভাবনা। তাদের ভাষায় -" যখন পার্থিব আত্মা উক্ত মহান আত্মার সাথে সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হয়, তখন পার্থিব আত্মার মধ্যেও মহান আত্মার মত নূরের প্রবাহ সৃষ্টি হয়।" অন্তর্নিহিত সারের দিকে লক্ষ্য করেই তারা নক্ষত্র পূজা করে থাকে। তারা নক্ষত্রের নামে প্রতিমা বানায়, প্রতিকৃতি তৈরী করে, তার কাছে দোয়া প্রার্থনা করে। কবর পূজকরাও ঠিক ঐ একই কাজ করে। তারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে। কবরের উপরে মসজিদ বানায় । তার উপর গালিচা চড়ায়। বাতি জ্বালায় , কবর রক্ষণাবেক্ষণ করে। কবর বাসীর কাছে দোয়া করে। তাদের কাছে মানত করা ছাড়াও প্রভৃতি বহু অবৈধ কাজ তারা করে থাকে।

আল্লাহ তাঁর রাসূলগন (সঃ) কে পাঠিয়েছেন। কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে পূর্বোল্লেখিত পাপ থেকে মুক্ত করা। যারা একাজ করে তাদেরকে কাফির ঘোষণা দেয়া। তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়া। তাদের সম্পদ হরণও রক্ত প্রবাহকে বৈধ করা, তাদের সন্তান সন্ততিকে ক্রীতদাসে পরিণত করা। বস্তুতঃ এ পাপ কর্মের মূল উৎপাটন ও এটাকে বাতিল করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সঃ) কাজ করেছেন। যত প্রকার মাধ্যম এর নিকটবর্তী হওয়ার পিছনে ইন্ধন যোগায় তা দূরীভূত করার জন্যও তিনি(সঃ) কাজ করেছেন।

কিন্তু উক্ত পথভ্রষ্টরা ও পথ বিচ্যুতকারীরা তাঁর(সঃ) পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাঁর(সঃ) ইচ্ছাকে তারা অপব্যাখ্যা দিয়েছে। যেমন তারা বলেছে -"যখন কোন বান্দাহ তার আত্মার সাথে আল্লাহর নিকটতম রূহের সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়। তার গুরুত্ব অনুধাবন করে তারমুখোমুখি দাঁড়ায়, অন্তর দিয়ে তার পাশে অবস্থান নেয়, তখন উভয়ের মধ্যে একটি যোগ সূত্র গড়ে উঠে। এযোগ সুত্রের মাধ্যমে উক্ত রূহ আল্লাহ থেকে যে নিয়ামত লাভ

করে তা এ ব্যক্তির রূহের মধ্যেও প্রবাহিত হতে থাকে।" তারা এ বিষয়টাকে পার্থিব সম্পর্কের সাথে এ ভাবেই তুলনা করে যে, যদি কেউ কোন ধনী ব্যক্তির খাদিম হয়, কোন বাদশাহের সংস্পর্শে আসে ও তাদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে তখন উক্ত ব্যক্তি ঐ ধনী ব্যক্তি বা বাদশাহের কাছ থেকে যে সমস্থ উপহার সামগ্রী ও দান লাভ করে তার সাথের সম্পর্কিতরাও তাদের সম্পর্কের পরিমাপ অনুযায়ী তা থেকে উক্ত জিনিষের ভাগ পেয়ে থাকে।

* * * *

পূর্বোল্লেখিত কারণেই তারা কবর ও কবর বাসীদেরকে পূজা করছে। তারা এ ভেবে কবরবাসীদেরকে আল্লাহর কাছে শাফায়াত কারী বা সুপারিশকারী বানিয়েছে যে, তাদের শাফায়াত দ্বারা ইহকাল ও পরকালে বেশী লাভবান হবে। গোটা কুরআন প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের মতামতকে বাতিল প্রমাণ করা ও তাদের প্রমাণাদিকে প করার কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর রাসূলের(সঃ) ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে,

إن يردن الرحمن بضر فلا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.

"যদি দয়ালু আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে চান, তাদের শাফায়াত(সুপারিশ) আমার কোন কাজেও আসবে না, আমাকে তারা বাঁচাতেও পারবে না।" (ইয়াসীন ২৩)

আল্লাহ তা'লা অন্যত্র বলেন–

أم اتخذوا من دون الله شفعاء

"তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে?" (যুমার- ৪৩)

আল্লাহ বলেন–

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى

"এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তার জন্য ছাড়া অন্য কারো জন্য তারা শাফায়াত করে না।" (আম্বিয়া–২৮)

আল্লাহ বলেন –

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

"অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া তাঁর কাছে অন্য কোন সুপারিশ কোন কাজে আসবে না।" (সাবা –১৩)

কেননা আল্লাহ তাঁর কুরআনে সুপারিশ কে দুটি শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রথম শর্তঃ যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তিনি আল্লাহর প্রিয় জন হবেন।

দ্বিতীয় শর্তঃ সুপারিশকারী সুপারিশের অনুমতি প্রাপ্ত হবেন। উপরোল্লেখিত আয়াত গুলো এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, এ দুটি শর্ত পূরণ ছাড়া সকল সুপারিশ ও শাফায়াত নিষ্ফল হবে। আল্লাহ বলেন–

ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هولاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله بما لايعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

"উপকার ও অপকার কোন কিছুর যারা ক্ষমতা রাখে না, আল্লাহকে ছেড়ে তারা এদের উপাসনা করে। এবং তারা এও বলে যে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত কারী। হে মুহাম্মদ(সঃ) তুমি বলে দাও -তোমরা কি পৃথিবী ও আসমান সম্পর্কে আল্লাহকে এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না। তিনি পবিত্র। ওরা যার সাথে আল্লাহকে শরীক করে, তিনি তাথেকে বহু উর্ধ্বে।" (ইউনুস- ১৮)

অন্যদেরকে সুপারিশকারী মেনে নেয়া ব্যক্তিরা আল্লাহর ভাষায় মুশরিক। (তাঁর আদালতে) যোগ্য সুপারিশকারী নির্বাচনের কারণে সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না। বরং সুপারিশ করার জন্য আল্লাহর অনুমোদন ও সুপারিশ যার জন্য করা হবে, তাকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্যই মাত্র

সুপারিশ গ্রহন করা হয়। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া যে অন্যকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করে সে মুশরিক। এ সুপারিশ মূল্যহীন। যে জন্য সুপারিশ করা হবে তাও নিষ্ফল। অতঃপর যে আল্লাহকে ইলাহ(উপাস্য) ও তার নিকটতম হওয়ার জন্য আল্লাহকে প্রিয়জন বলে গ্রহণ করে। তার সন্তুষ্টি কামনা করে তাঁরই গজব ও রাগ হতে মুক্তি চায়– তাকেই সুপারিশ প্রার্থনা করার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন।

এ জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার যোগ্য ব্যক্তিরাই হচ্ছেন একত্ব বাদী, যারা শিরক ও শিরকের ধারে কাছের কাজও পরিহার করেছেন। আর মুশরিক সম্প্রদায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তিনি তাদেরকে সুপারিশ প্রার্থীদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন না। এর সার কথা এটাই যে, সকল সুপারিশের অনুমোদন আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত। তাঁর সাথে কেউ ভাগী নেই। তার সৃষ্ট জীবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছেন রাসূল(আঃ) গণ। এর পর নিকটতম ফিরিশতাগণ,

তারা আল্লাহর নিয়ন্ত্রনে প্রতিপালিত। তাদের কাজ ও কথা আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশের আওতায় পরিচালিত হয়। তারা তাঁর অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া কোন কথা বলেন না। কোন কাজ করেন না। তাদের কাউকে যদি কেহ আল্লাহর অংশীদার মনে করে এবং তাকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করে; এই ধারণা করে যে– উক্ত সুপারিশকারীর সুপারিশে আল্লাহর আদালতে তার অবস্থা উন্নতি হবে; তাহলে সে আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে একেবারেই মূর্খ, তার কি কর্তব্য, কি কর্তব্য নয়; এ বিষয় সে একেবারেই জাহিল। পৃথিবীর অনেক দাম্ভিক বাদশাহের চাপরাশি বা বন্ধু-বান্ধবদের কে অন্যরা তাদের কাছে কোন প্রয়োজনে বা কোন গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় সুপারিশ করার অনুরোধ জানায়। এই পথভ্রষ্টরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে এই বাদশাহের সাথে তুলনা করে।

এই অগ্রহণযোগ্য তুলনার কারণে তারা মূর্তি পূজা করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আল্লাহকে উপেক্ষা করে অন্যকে শাফায়াত কারী হিসাবে গ্রহণ করেছে। এটাই হচ্ছে সৃষ্টজীবকে আল্লাহর সাথে শরীক করার মূল কারণ। যা ভেবেই তারা এটা

করুক না কেন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সুপারিশ কারী মনে করাটা আল্লাহর রুবুবিয়াত (প্রভূ হওয়ার যোগ্যতা) কে খাটো করে দেখা ও তাঁর অধিকারকে সংকুচিত করারই শামিল। সে হয়ত এটাই মনে করে যে,আল্লাহ তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নন। সুতরাং এটা অন্যের মাধ্যমে জানানো প্রয়োজন। তিনি দূরে অবস্থান করছেন তাই তার প্রার্থনা অন্যের মাধ্যমে না গেলে তিনি শুনতে পারেন না। পৃথিবীতে যেমন অনেকক্ষেত্রে দাবী পূরণ হওয়ার আশা না থাকলে অন্যের মাধ্যমে কর্তার কাছে তার দাবী পেশ করার রেওয়াজ আছে, তার ধারনা-আল্লাহ ঠিক তেমনি। বস্তুতঃ পৃথিবীতে সুপারিশ কারীর সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তা এই জন্য মানতে বাধ্য হয় যে, সে অধিকাংশ সময় সুপারিশ কারীর মুখাপেক্ষী হয়। লাভবান হওয়া, প্রসিদ্ধি লাভ করা, সম্মানী হওয়া ইত্যাদির জন্য সে তার করুণার প্রত্যাশী থাকে। উক্ত সুপারিশ প্রার্থী কখনো বা এটাও চিন্তা করে যে, পৃথিবীর রাজাদের মতো আল্লাহও সুপারিশ কারীর মাধ্যম ছাড়া কারো দাবী পূরণ করেন না। অথবা সে এধারণাও করে যে,

স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের জন্য সৃষ্ট জীবের অসিলা গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। বাস্তবে পৃথিবীর রাজা বা উর্ধ্বতন কারো কাছে কোন কিছু পাওয়ার জন্য মানুষ অন্যকে অসিলা হিসাবে গ্রহণ করে। এ সুপারিশ কারী উক্ত রাজা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চেয়ে ক্ষমতাবান হয়। উক্ত সুপারিশ কারীর মতের বিরোধীতা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব হয় না। আবার কখনো বা সুপারিশ কারী উক্ত রাজা ও উর্ধ্বতন কর্তার অধস্তন কর্মচারী ও (খাদিম) ক্রীতদাস হয়ে তাকে। সঠিক অর্থে এরাও তাদের কাজের শরীক বা অংশীদার। কেননা এরা তাদের নির্দেশ বাস্তবায়ন করে। তাদের মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকে। এরা নিঃসন্দেহে এদের সহযোগী ও সাহায্যকারী। এরা নাহলে তাদের ক্ষমতা শিকায় উঠত। সুতরাং তারা এদের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে এদের সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে, যদিও এটিকে তারা মনের দিক থেকে মেনে নেয় না। কেননা যদি তারা এদের সুপারিশ প্রত্যাখান করে এবং না মেনে নেয়, তাহলে আনুগত্যহীনতার ভয়ে তারা ভীত থাকে। তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও এরা

যেতে পারে বলে তারা এই আশংকা করে। সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এদের সুপারিশ গ্রহণ করা ছাড়া কোন গত্যান্তর থাকে না। অনেক সময় সুপারিশকারীরা সুপারিশ গ্রহণ কারীদের কাছে তাদের খাদ্য সামগ্রীর জন্যও মুখাপেক্ষী থাকে। তবে এ পরিস্থিতিতেও উক্ত সুপারিশ গ্রহণ কারীরা এদের সাহায্যও সহযোগিতার প্রত্যাশী হয়। অতএব পৃথিবীতে একে অপরের মুখাপেক্ষী । (তবে আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা অবান্তর)

যিনি অমুখাপেক্ষী ধনী। যার স্ব সত্তা প্রয়োজন থেকে অনেক উর্ধ্বে। বরং তিনি ব্যতিত সকলেই তাঁর কাছে ভিখারী। আসমান-যমীনের সকল কিছু তাঁরই দাস। তাঁরই প্রচ শক্তির কাছে সকলেই পরাজিত। তাঁর ইচ্ছাই সবাই বাস্তবায়ন করেছে মাত্র। তিনি যদি সকলকে ধ্বংস করেন, তাঁর মর্যাদা, রাজত্ব, বাদশাহী, প্রভূত্ব ও উপাস্যতা থেকে একটি কণা পর্যন্তও কমতি হবে না। সুতরাং তাঁর কাছে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেউ সুপারিশ করার অধিকারই রাখেনা। সুপারিশ ও শাফায়াতের

একমাত্র অধিকারী তিনি নিজেই। যেমন তিনি বলেছেন-

قل لله الشفاعة جميعا

" বলে দাও, সকল প্রকার সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর জন্য ।" (যুমার-৪৪)

বান্দাদের প্রতি করুনা বশতঃ আল্লাহ নিজেই নিজের কাছে সুপারিশ করেন। পরে যাকে চাবেন সুপারিশের অনুমতি দিবেন। তাই সত্যিকার অর্থে সুপারিশের কর্তৃত্ব তাঁর নিজের জন্যই সংরক্ষিত। আল্লাহর নিজের কাছে নিজের সুপারিশের পরে যারা তাঁর কাছে সুপারিশ করবে, তারা তাঁর অনুমতি ও নির্দেশ ক্রমেই করবে। যা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্রতা বশত। যা তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন। যেমন তিনি বলেছেন-

ليس له من دونه من ولى ولا شفيع.

"তিনি ছাড়া তাঁর জন্য অন্য কোন অভিভাবক বা সুপারিশ কারী নেই।" (আনয়াম-৫১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

مالكم من دونه من ولى ولا شفيع.

" তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশ কারী নেই। "(সিজদাহ-৪)

এখানে আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, বান্দার জন্য আল্লাহ ছাড়া কেউ সুপারিশ কারী নেই। তবে হাঁ যদি তিনি কোন বান্দার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন, তার জন্য যে সুপারিশ করতে চায় তাকে সুপারিশের অনুমতি দিবেন। যেমন তিনি বলেন-

ما من شفيع إلا من بعد إذنه .

" তাঁর অনুমতি পাওয়া ছাড়া কোন সুপারিশ কারী নেই ।"(ইউনুছ-৩)

অতএব তাঁর অনুমতিক্রমের এ সুপারিশ তাঁরই সুপারিশের নামান্তর। সুতরাং তিনি ব্যতীত কোন সুপারিশ কারী নেই বরং সকল সুপারিশ কারী তাঁর অনুমতি প্রাপ্ত। বস্তুতঃ এ পদ্ধতি দুনিয়ায় একে অপরের জন্য সুপারিশের পদ্ধতি থেকে বেশ ভিন্ন। কেননা এখানে কোন অনুমতির বালাই থাকেনা। বরং অন্য কোন বিচ্ছিন্ন কারণে সুপারিশ গ্রহণ কারী সুপারিশ কারীর সুপারিশ মেনে নিবেন, এই ভেবেই সে সুপারিশ করার প্রয়াস পায়। তার এ মেনে নেয়া

সুপারিশ কারীর ক্ষমতার ভয়ে অনিচ্ছা সত্তেও হয়ে থাকে অথবা তাথেকে করুণা পাওয়ার আগ্রহের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে সুপারিশ গ্রহণ করানোর জন্য এমন একজন সুপারিশ কারীর প্রয়োজন যা থেকে সুপারিশ গ্রহণ কারী এমন করুণা লাভ করতে পারবে যা তাকে কোন ফায়দা অর্জনের সুযোগ করে দেবে। অথবা যার ক্ষমতাকে সে এমন ভয় পায় যা তাকে সুপারিশ মেনে নিতে বাধ্য করবে। আর এ পদ্ধতি আল্লাহর কাছে সুপারিশের পদ্ধতি হতে ভিন্নতর। এখানে এমন কোন সুপারিশ নেই বা এমন সুপারিশের অনুমতি দেয়া হয় না যা গ্রহণ করে নিতে কোন আপত্তি আছে। আর সুপারিশ কারীও আল্লাহর কাছে এ জন্য সুপারিশ করে না যে তার কাছে আল্লাহর কোন প্রয়োজন আছে বা আল্লাহ তার শক্তিতে শংকিত বা তার কাছে কিছু পাওয়ার জন্য আল্লাহর আগ্রহ আছে। বরঞ্চ সে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তাঁর আনুগত্য দেখানোর জন্যই সুপারিশ করে থাকে। সে সুপারিশের জন্য আদিষ্ট। হুকুমের আনুগত্য তার জন্য অত্যাবশ্যক। আল্লাহর ইচ্ছা শক্তি ছাড়া নবী(আঃ) ফিরিশতা বা অন্য কেউ

সুপারিশের জন্য নড়া চড়া করতে সমর্থ হবেন না। সুতরাং আল্লাহই নিজে সুপারিশ কারীকে সুপারিশ করার ময়দানে নড়াচড়ার সুযোগ দেন। অতঃপর সে সুপারিশ করে। যেখানে এ সুপারিশ গ্রহণ করার বাধ্য বাধকতা নেই। আর বান্দাদের নিকটে সুপারিশের পদ্ধতি এটাই যে, সুপারিশ করাটাই সুপারিশ গ্রহণকারীকে ময়দানে নিয়ে আসে। অতঃপর সে উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আর যে ব্যক্তি এখানে বর্ণিত শাফায়াত বা সুপারিশের পদ্ধতিগত অর্থ বুঝতে সক্ষম হবে সে ব্যক্তি তাওহীদ বা একত্বাদের আসলতথ্য পাবেন। এবং তিনিই শিরক হতে মুক্ত হতে পারবেন। কেননা শিরক আল্লাহর অযোগ্যতারই ইংগিত বহন করে। মুশরিক এটা মেনে নিক বা নাই নিক আল্লাহর যোগ্যতার কমতি মনে করেই অন্যকে সে তাঁর সাথে শরীক করে। রব্ব হিসেবে আল্লাহর যে গুণাবলী ও পূর্ণতা থাকার প্রয়োজন শিরক যেহেতু সেটাকে খাটো করে ফেলে সে জন্য আল্লাহর বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও তিনি যে পরিপূর্ণ রব্ব সে হিসাবে শিরক কারীকে তিনি কখনো ক্ষমা করবেন

না। এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান করবে। এমন কোন মুশরিক নেই যে আল্লাহর যোগ্যতাকে খাটো করে দেখে না তা সে যতই আল্লাহকে অনেক অনেক বড় বলে স্বীকৃতির দাবী করুক না কেন।

ঠিক তদানুরূপ কোন বিদয়াত সৃষ্টিকারী নেই যে আল্লাহর রাসূল(সঃ) এর যোগ্যতাকে ছোট করে না দেখে, তা সে রাসূল(সঃ) কে অতি মহান বলে যতই শ্লোগান দিক না কেন! বরঞ্চ সে বিদয়াতকে সুন্নতের চেয়ে বেশী গ্রহণ যোগ্য মনে করে। দৃশ্যতঃ এটাই মনে হয় যে, এই পরিস্থিতিতে যে বিদয়াতকে জেনে বুঝে গ্রহন করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সঃ) এর বিরোধিতাই থাকে তার উদ্দেশ্য। আর এ ক্ষেত্রে যে না জেনে না বুঝে অন্যকে অনুকরণের জন্য শুধু বিদয়াতকে গ্রহণ করে সে সেটাকে বাস্তবে মনে প্রাণে সুন্নত হিসাবেই মেনে নেয়।

ইবনি কাইয়িম(রাহঃ) তাঁর 'ইগাছা' গ্রন্থে বলেন- মালিক বিন আনাস(রাহঃ) কত সুন্দর কথাই না বলেছেন– যা (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ) এ উম্মতের প্রথম যুগের লোকদের সংশোধন করেছিল, শুধুমাত্র তা'ই এ উম্মতের শেষ যুগের লোকদেরকে

সংশোধন করতে পারে। বরঞ্চ নবী(আঃ) দের সাথে তাঁরা যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তার বাস্তবায়ন যত কমে যাবে, তত তাদের ঈমান লোপ পেতে থাকবে। সংশোধনের পরিবর্তে তারা শিরক ও বিদয়াতকেই আবিষ্কার করবে। আমাদের পূর্ববর্তী সাধু-মনিষীরা তাওহীদ ও একত্ব বাদকে শিরকের গন্ধমুক্ত করেছেন। এমনকি এর ধারে কাছেও যাতে শিরক প্রশ্রয় না পায়, তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।" অলীদ বিন আব্দুল মালিকের শাসন আমলেও রাসূল(সঃ) এর কবর সম্বলিত কক্ষ মসজিদে নববী(সঃ) এর বাহিরে ছিল। নামায আদায়, দোয়া করা, ইবাদাত করা বা অন্য কোন কাজে সাহাবী(রাঃ) ও তাবেয়ী গন(রাহঃ) কখনো এ কক্ষে প্রবেশ করতেন না। বরং এ সমস্ত ইবাদাত তারা মসজিদেই আদায় করতেন। তাদের কেহ যদি রাসূল(সঃ) এর কবরে সালাম পাঠ করতেন, তিনি দোয়ার সময় পিছনে দেয়ালের দিকে পিঠকরে কিবলামুখী হতেন এবং দুয়া করতেন।

হজরত সালামাহ বিন আরদান(রাহঃ) বলেন- আমি হযরত আনাস বিন মালিক(রাহঃ) কে

রাসূল(সঃ) এর প্রতি সালাম জানাতে দেখেছি। এর পর তিনি তাঁর পিঠ কবরের দেয়ালে লাগিয়ে দুয়া করেছেন। দুয়ার সময় কবর সামনে নিয়ে দুয়া করা নিষিদ্ধ এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

তবে সালাম প্রদানের সময় কবরকে সামনে রাখা যাবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা(রাহ্ঃ) বলেন– "কবরে সালাম প্রদানের সময় কিবলাকে সামনে রাখতে হবে কবরকে নয়।" অন্যান্যরা কবরকে সামনে রাখা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালিক(রাহ্ঃ) ও তাঁর অনুসারীদের উপরে একটি মিথ্যা ঘটনার উদ্ধৃতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু সেই উদ্ধৃতি ছাড়া কোন ইমাম যে দুয়ার সময় কবরকে সামনে রাখতেন তার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। ঠিক এ ধরনের একটি অসমর্থিত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী(রাহ্ঃ) ইমাম আবু হানিফা(রাহ্ঃ) এর কবরকে সামনে নিয়ে দুয়া করেছেন। বস্তুতঃ এ বর্ণনা একেবারেই সরাসরি মিথ্যা। বরং অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমাম মালিক(রাহ্ঃ),

ইমাম শাফেয়ী(রাহ্ঃ) ও তাঁদের অনুসারীরা কবর যিয়ারত কারীকে দুয়ার সময় কিবলা মুখী হতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এমনকি তাদের মত এটাই যে, কবরের পাশে দুয়া হচ্ছে ইবাদত। যেমন তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে– الدعاء هوا لعبادة "দুয়াই হচ্ছে ইবাদত।" আর সালফে সলিহীন বা পূর্ববর্তী মনিষীদের মধ্যে ছাহাবী(রাঃ) ও তাবেয়ীগন(রাহ্ঃ) সকলেই ইবাদতকে শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। কবরের পাশে রাসূল(সঃ) যেগুলোর অনুমতি দিয়েছেন যেমন কবর বাসীর জন্য গুনাহ মাফ চাওয়া, তাদের উপরে রহমত বর্ষিত হওয়ার প্রার্থনা প্রভৃতি করা ছাড়া তারা কিছুই করতেন না।

* * * *

(মৃতব্যক্তি যিয়ারতকারীর দুয়ার মুখাপেক্ষী)

মূল কথা মৃত ব্যক্তির সকল আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে দুয়া পাওয়া ও সুপারিশ লাভের মুখাপেক্ষী থাকে। এই জন্যই মৃতের জানাযার নামাজে কিছু দোয়াকে শরীয়তে ওয়াজিব ও কিছুকে মুস্তাহাব করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে এ ধরণের দোয়া কোন জীবিত ব্যক্তির জন্য করার প্রচলন শরীয়ত করে নাই। হযরত আউন বিন মালিক(রাঃ) বলেন– একদা রাসূল(সঃ) জানাযার নামাযে দোয়া করেছিলেন, আমি তা থেকে সেই দোয়া মুখস্ত করেছি। আর তা হচ্ছে–

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه و أكرم منزله و وسع مدخله وأغسله بالماء و الثلج و البرد ونقه من الذنوب و الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس و أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و زوجا خيرا من زوجه و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و من عذاب النار ،، حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء

رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت – رواه مسلم .

"হে আল্লাহ, তাকে আপনি গুনাহ মাফ করুন, তার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন, তাকে সুস্থতা ও সুষ্ঠতা দান করুন, তাকে আপনি ক্ষমা করুন, তার আবাস স্থলকে আপনি মর্যাদাবান করুন, তার প্রবেশ দ্বারকে আপনি প্রশস্থ করুন, তাকে পানি বরফ ও ঠা া বৃষ্টি দ্বারা ধৌত করুন। যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা মুক্ত করা হয় তেমনি আপনি তাকে গুনাহ মুক্ত করুন। তার ঘরকে উত্তম ঘরে পরিবর্তন করুন, তার পরিবার পরিজনদেরকে আরো উত্তম পরিবার পরিজনে তার স্ত্রীকে আরো উত্তম স্ত্রীতে পরিবর্তন করুন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তাকে কবরের শাস্তি ও জাহান্নামের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিন। (বর্ণনা কারী বলেন) দোয়ার এই পর্যায়ে আমার আকাঙ্খা জাগলো হায়! রাসূল(সঃ) যে মৃতের উদ্দেশ্যে এই দোয়া পাঠ করছেন আমিই যদি সেই মৃত হতাম। (মুসলিম)

وقال ابو هريرة رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى صلاته على

الجنازه - (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها) رواه الإمام أحمد رحمه الله .

" হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- আমি রাসূল (সঃ) কে এক জানাযার নামাযে দুয়া করতে শুনেছি - (হে আল্লাহ আপনি তার রব্ব, আপনি তাকে সৃস্টি করেছেন, আপনি তাকে ইসলামের হিদায়িত দান করেছেন, আপনি তার রূহ কবজ করেছেন। আপনি তার প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু সম্পর্কে সব চেয়ে বেশী জানেন।) ইমাম আহমদ (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।"

وفى سنن أبى داود رحمه الله عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال- إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء .....

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল(সঃ)বলেছেন "যখন তোমরা মৃতের জন্য জানাযা আদায় করবে, তখন অত্যন্ত ইখলাছের সাথে তার জন্য দোয়া করবে।"

وعن عائشة وأنس أنه عليه السلام قال- ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه - رواه مسلم .

'হযরত আয়িশা(রাঃ) ও হযরত আনাস(রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে নিশ্চয় রাসূল (সঃ)বলেছেন- "কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযে যদি একশত মুসলমান উপস্থিত হয়ে তার জন্য শাফায়াত(সুপারিশ) করেন সে শাফায়াত গ্রহণ করা হয়।"(মুসলিম)

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) رواه مسلم .

ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন- "আমি রাসূল(সঃ) কে বলতে শুনেছি- যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় অতঃপর তার জানাযার নামাযে আল্লাহর সাথে শরীক করেনা এমন চল্লিশজন ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করে নেন।"(মুসলিম)

এখানে স্পষ্ট যে, জানাযার নামায অর্থ মৃতের জন্য দুয়া, গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা ও তার জন্য সুপারিশ। (অতএব যখন মৃতের জানাযায় আমরা কেহ উপস্থিত হব তার জন্য দুয়া করব। তার কাছে দুয়া করব না।) তার জন্য সুপারিশ করবেন। সুপারিশ করার আবেদন করবেন না। দাফনের পরে মৃতের জন্য দোয়া ও সুপারিশ করা অতীব জরুরী। কেননা দাফনের পর মৃত তার নিজের জন্য দোয়ার বেশী মুখাপেক্ষী থাকে। সেতো তখন প্রশ্নের বা অন্যান্য অবস্থার মুখোমুখী হয়।

روى أبوداود عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه عليه السلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال – استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل .

"ইমাম আবু দাউদ(রাহ্ঃ) হযরত ওছমান(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন যখন রাসূল(সঃ) মৃত ব্যক্তির দাফন শেষে কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন বলতেন – তোমরা তোমাদের ভাই এর জন্য ইসতিগফার কর। (গুনাহ মাফ চাও) এবং

তার দৃঢ়তার জন্য দুয়া কর। কেননা এক্ষুনি তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।"

সুফিয়ান ছাউরী(রাহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন– যখন মৃত ব্যক্তিকে তার রব্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় শয়তান তখন অত্যন্ত জাঁক জমক চেহারায় উপস্থিত হয়ে নিজের দিকে ইংগিত করতে থাকে। এবং বলতে থাকে বলো আমি তোমার রব্ব। ইমাম তিরমিযী(রাহঃ) বলেন- এটাই বড় ফিতনা। একারণেই রাসূল(সঃ) মৃতের দৃঢ়তার জন্য দুয়ার আহবান জানিয়েছেন। দুয়াটি হচ্ছে এই যে-

اللهم ثبت عند المسألة منطقه و افتح أبواب السماء لروحه.

"হে আল্লাহ, (এই গুরুত্ব পূর্ণ সময়ে) তার ভাষার দৃঢ়তা দান করুন এবং তার রূহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দিন।"

তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে এই দোয়া করাকে ভাল মনে করতেন যে –

اللهم أعذه من الشيطان الرجيم.

"হে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত শয়তান থেকে রক্ষা করুন।"

রাসূল(সঃ) এর পক্ষ থেকে কবর বাসীও কবর বাসীর জন্য পূর্বোল্লেখিত এই বিশোর্ধ সুন্নত প্রণীত হয়েছে। এটাই খোলাফায়ে রাশিদীনের পদাংক। এটাই সকল সাহাবী(রাঃ) ও তাবেয়ীগনের(রোহঃ) পথ। কিন্তু কবরবাসীর ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে, বিদয়াতকারী ও পথচ্যুত ব্যক্তি বর্গ তা পরিবর্তন করে ছেড়েছে। তারা কবর বাসীর জন্য দোয়াকে নিজের জন্য দোয়া বা তার কাছে দোয়া করাতে বদল করেছে। মৃতের জন্য সুপারিশকে মৃতের কাছে সুপারিশের প্রার্থনায় রূপান্তরিত করেছে। রাসূল(সঃ) সমর্থন দিয়েছেন যে, মৃতের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য কবর যিয়ারত করতে হবে। তারা আল্লাহর নাম ঢেকে রেখে মৃতদের নামে শপথ করতে শুরু করেছে। ইবাদতের মূল সার যে দোয়া তাকে কবর স্থানের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। তারা হুজুরে কলবের(বিনয় চিত্তে) অবস্থায় কবরে উপস্থিত হওয়াকে মসজিদ বা শেষ রাত্রিতে বিনয় অবনত চিত্তে নামায আদায় থেকে উত্তম মনে করেছে। মৃতের কাছে চাওয়া, মৃতের মাধ্যমে দোয়া করা, কবরে দোয়া করা, শরীয়ত সম্মত উত্তম আমল হওয়া

একেবারে সম্ভব নয়। আর এটাও সম্ভব নয় যে, রাসূল(সঃ) এর ভাষায় উত্তম তিন শতাব্দীর মনিষীরা এই উত্তম আমল বিমুখ ছিলেন। এটাও অবান্তর যে, উত্তম সেই শতাব্দী গুলোর পরবর্তী উত্তর সুরীরা যা বলে, তা না করে কৃতকার্য হবে ও যার নির্দেশ দেয়া হয়নি তাই করে সফলতা লাভ করবে। আপনি যদি এ বিষয় সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে আপনি উক্ত শতাব্দীগুলোর কারো থেকে কোন ধরণের ছহীহ, হাসান, দুর্বল সনদ বিহীন হাদীসও উল্লেখ করুন যা এই কথা প্রমান করবে যে, যখন তাদের কোন প্রয়োজন দেখা দিত তারা কবরে যেতেন। কবর স্পর্শ করতেন। কবর বাসীদের কাছে প্রার্থনা করতেন, এমনকি তারা কবরের নিকট নামায আদায় করতেন, কবর বাসীদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন বা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য কবর বাসীদের নিকট প্রার্থনা করতেন। কোন একটি বর্ণনাও এই দাবীর সত্যতা প্রমাণ করবে কি?

কক্ষনো নয়। এটি একেবারেই অসম্ভব। বরং উক্ত পথ ভ্রষ্টরা চাইলে এমন অসংখ্য দলীল নিয়ে আসতে পারবে যা স্পষ্টই প্রমান করবে যে, তারা

তাদের পূর্বসূরী মনিষীদের সরাসরি বিরোধিতা করছে। এমনকি এই কবর যিয়ারতের বিষয় নিয়ে বহু পুস্তক প্রণীত হয়েছে। যেখানে স্বয়ং রাসূল(সঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) ছাহাবী(রাঃ) ও তাবেয়ীগন(রাহঃ) থেকে একটি অক্ষরও বর্ণিত হয়নি। বরং তাদের এই সমস্ত পুস্তকে রাসূল(সঃ) থেকে বর্ণিত পূর্বোল্লেখিত মারফু হাদীস– "আমি কবর যিয়ারতকে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে যদি কেউ চায় যিয়ারত করতে পারে। তবে সেখানে কেউ তোমরা অবৈধ উক্তি করবে না" এর পরিপন্থী বহু কিছু পরিলক্ষিত হয়। কথায় ও কাজে কবরের কাছে শিরক করার চেয়ে আর কিইবা অবৈধ ও অশ্লীল হতে পারে।

* * * *

(কবর পূজার ফিতনার বিষয়ে মুসলিম মনিষীদের উক্তি ও কর্মকাণ্ড)

ছাহাবায়ে কিরাম(রাঃ) এর পক্ষ হতে এ বিষয়ে এত বেশী বর্ণনা এসেছে যে, এগুলো একত্রিত করা সাধ্যাতীত। তম্মধ্যে অন্যতম হাদীস যা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رآى أنس بن مالك رضى الله عنه يصلى عند القبر فقال القبر القبر .

"একদা হযরত ওমর বিন খাত্তাব(রাঃ) হযরত আনাস বিন মালিক(রাঃ) কে কবরের নিকট নামায আদায় করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি বলে উঠলেনঃ কবর! কবর! "

ইবনুল কাইয়িম(রাহঃ) তাঁর 'ইগাছা' গ্রন্থে বলেন- "ওমর(রাঃ) এর উক্তি স্পষ্ট এ প্রমানই বহন করে যে, কবরের নিকটে নামায আদায়ের প্রসংগে নবী(সঃ) এর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সকল ছাহাবী(রাঃ) অটল ছিলেন।"

আলোচ্য হাদীসে কবরের নিকট হযরত আনাস(রাঃ) এর নামায আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি বৈধ বিশ্বাস করেই নামায আদায় করেছেন এটা ঠিক নহে। তিনি সম্ভবতঃ কবরকে দেখেন নি। অথবা এটাকে তিনি কবর বলে জানতেন না। অথবা এটা যে কবর তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন করলেন; তখন তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক তাঁর মাগাযী গ্রন্থে ইউনুস বিন বাকির থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু খালজাহ খালিদ বিন দিনার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আবু আলিয়া বলেছেন- " যখন আমরা ইরানের শহর তুসতার' বিজয় করলাম. তখন হুর্‌মুযানের বাইতুল মালে একটা খাটিয়া দেখতে পেলাম, তার উপরে রয়েছে একজন মৃত ব্যক্তি। মাথার কাছে রয়েছে একটি ছহীফা। আমরা ছহীফা নিয়ে ওমর (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি কায়াব (রাঃ) কে ডাকলেন। কায়াব(রাঃ) এটাকে আরবী অক্ষরে লিখলেন। আমি আরবীয়দের মধ্যে সর্ব প্রথম এটি পাঠ করলাম। এটাকে আমি

কুরআনের স্বরেই তিলাওয়াত করেছিলাম।" আমি আবু আলিয়াকে জিজ্ঞাস করলাম সেখানে কি লিখা ছিল? তিনি বললেন " তোমাদের চরিত্র, তোমাদের কর্ম-কা , তোমাদের কথা বার্তার ভুল ভ্রান্তি ও কিছু ভবিষ্যত বাণী। আমি যখন বললাম- এই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ধারনা কি? তিনি বললেন- এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত দানিয়াল(আঃ)। আমি প্রশ্ন করলাম- তিনি কতদিন আগে মারা গেছেন বলে আপনারা মনে করেন? তিনি বললেন- আনুমানিক তিনশত বছর। আমি বললাম- তার শরীরের কোন অংশ কি পরিবর্তন হয়নি? তিনি বললেন- না। তবে স্কন্ধের কিছু চুল সামান্য পরিমাণ বিকৃতি লাভ করেছিল। নিশ্চয় নবীদের গোশত মাটি ভক্ষণ করে না। প্রাণীরাও তা খায় না। আমি বললাম- এ শবদেহ হতে তারা কি আশা করত? তিনি বললেন- যখন আসমান পানির দরজা বন্ধ করে দিত, তখন তারা এই মৃতদেহকে বাইরে নিয়ে আসত। এর পর বৃষ্টি হওয়া শুরু হত। আমি প্রশ্ন করলাম- আপনারা এ মৃতদেহ কি করলেন? তিনি জবাব দিলেন- আমরা দিনের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তেরটি কবর খনন

করলাম। অতঃপর রাত্রিতে তাঁকে একটি কবরে দাফন করলাম। নবী হিসেবে মানুষের কাছে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট থাকার কারণে সকল কবরের উপরে মাটি দিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর সঠিক কবরকে কেউ খুঁজে বের করতে না পারে।

ঘটনাটি বিশ্লেষণ করুন। কিভাবে মুহাযির ও আনসারগণ তাঁর কবরকে সাধারণ কবরে পরিণত করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন তাও অনুধাবন করুন। এ ব্যবস্থা এই জন্য যে, লোকেরা যেন তাঁর এ কবরকে ফিৎনার স্থল না বানাতে পারে। খুঁজে বের করে এর কাছে যাতে দুয়া চাইতে না পারে। এ থেকে যাতে বরকত লাভের নিয়ত না করতে পারে। যদি তাদের পথভ্রষ্ট উত্তরসূরীরা এখন এই মৃতদেহকে পেত, তবে তা নিয়ে তরবারী যুদ্ধ করতে হলেও তা করত। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর ইবাদত করা শুরু করত। বস্তুতঃ এরা কবরকে প্রতিমায় রূপান্তারিত করে। যে কবরবাসী তাদের কিছুই দিতে পারে না, তার উপরে তারা কল্পিত মূর্তি বানায়। তার রক্ষণা বেক্ষণে নিয়োজিত হয়। এটাকে মসজিদের চেয়ে আরো বড় ইবাদত খানায় পরিণত করে।

কবরের নিকট দোয়া করা, সেখানে নামায আদায় করা যদি মর্যাদার কিছু হত তাহলে আনছার ও মুহাজির(রাঃ)গণ এ কবরের চিহ্ন অবশ্যই রাখতেন। এর নিকট দোয়া করতেন।এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের জন্য এটাকে সুন্নতে পরিণত করে যেতেন। বাস্তবে তাঁরাই তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল(সঃ) ও এই দ্বীন সম্পর্কে পরবর্তীতে এ সমস্ত সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত লোকদের চেয়ে বেশী ভাল জানেন। আর তাঁদের পদাংক অনুসারী তাবিয়ী(রাহঃ) গণও এই পথে চলেছেন। বিভিন্ন শহরে তাবেয়ী(রাহ্ঃ) দের কাছে বহু ছাহাবীগণ(রাঃ) এর কবরও ছিল। তাঁরাও সে সব শহরে বসবাস করতেন, কিন্তু কই! কেউতো তাদের মধ্য হতে এসব কবরে সাহায্য চাননি। কবরে দুয়াও করেননি। কবর বাসীদের মাধ্যমে কোন কিছু চাননি মদদ প্রার্থনা করেননি। ঘটনা বর্ণনা করার অনেক সঠিক মাধ্যমেও যেহেতু ইতি মধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি, সেহেতু এমন কিছু তাঁরা করে থাকলে অবশ্যই তা জানা যেত। একথা স্পষ্ট যে, কবরের নিকটে দোয়া করা অথবা কবরবাসীদের মাধ্যমে কোন কিছু চাওয়ার অর্থ এই যে, উক্ত

কবরবাসী তার জীবদ্দশায় সেই এলাকার সেরা ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞান গত ও কার্যত তাহলে কি উক্ত ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে ছাহাবী(রাঃ), তাবেয়ী(রাহ্ঃ) ও তাবি তাবিয়ী(রাহ্ঃ) গণ জানতেন না? উত্তম তিন শতাব্দীর সকলেই সেই সাধু পুরুষের মর্যাদা সম্পর্কে মূর্খ রয়ে গেলেন, আর তাদের উত্তর সূরীরা পরে এসে তাদের মর্যাদার খোঁজ পেয়ে কৃতকার্য হলেন? আর এটিও মানা যায় না যে, যাঁরা প্রতিটি উত্তম কাজ পুংখানুপুংখ ভাবে আঞ্জাম দিতেন সেই তিন শতব্দীর মনিষীরা সাধু-সজ্জনের মর্যাদা জেনেও এটাকে উপেক্ষা করেছিলেন। বিশেষ করে তারা তো নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মুখাপেক্ষী ছিলেন। আর বাস্তব অনেক অপছন্দ কাজকে আঞ্জাম দিতে বাধ্য করে। তাদের চাহিদা মিটানোর জন্য বারংবার দোয়া প্রার্থনার প্রয়োজন দেখা দেয়া সত্ত্বেও কবরের বিশেষ ফযীলত জানার পরেও কবরকে কেন উদ্দেশ্য করে তারা কিছু প্রার্থনা করলেন না, বস্তুতঃ এটা শরীয়ত ও প্রকৃতি এই উভয় মাপকাঠিতে অবান্তর। এ জন্য তারা দ্বিতীয় পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন কবরে দোয়া করার কোন আলাদা মর্যাদা

নেই। এ কাজ শরীয়ত সম্মত ও নয়। শরীয়তে এ কাজের অনুমোদন নেই। বরং এটা কবর পূজকদের স্বশরীয়ত ভূক্ত কাজ। আল্লাহ তাঁর দেয়া জীবন বিধানে এটাকে প্রশ্রয় তো দেনইনি - কোন দলীলও এ প্রসংগে অবতীর্ণ করেন নি।

* * * *

(ফিতনার ভয়ে উমার(রাঃ) এর নির্দিষ্ট গাছ কাটার নির্দেশ)

শিরকের সামান্য নাম গন্ধ যুক্ত বহু কাজকে যে, ছাহাবী(রাঃ) গণ সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন, প্রত্যাখ্যান করেছেন এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন একাধিক বর্ণনা কারী হযরত মারূর বিন সুয়াইদ(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- "আমি একদা মক্কার পথে হযরত উমার(রাঃ) এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। তিনি সে নামাযে- ও ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش অর্থৎ ফীল ও কুরাইশ সূরাদ্বয় পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি দেখলেন যে, জনসাধারণ বিশেষ এক গন্তব্য স্থানের দিকে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করলেন- তারা কোথায় যাচ্ছে? বলা হলো- 'হে আমীরুল মোমেনীন! তারা একটি মসজিদে যাচ্ছে যেখানে রাসূল(সঃ) নামায আদায় করেছিলেন। তারাও সেখানে নামায আদায় করবে।' তিনি বললেন-'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নবীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান গুলোকে অনুকরণ করার জন্য

ও এ সমস্ত স্থানকে গীর্জা ও প্যাগোডা বানানোর কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। হ্যাঁ যদি কেউ উক্ত মসজিদের নিকটে অবস্থান কালে নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তাহলে সে সেখানে নামায আদায় করবে । এখানে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করা ঠিক নহে।'

ছাহাবী গনের কাছে খবর এলো- যে গাছের নিচে রাসূল(সঃ) (বাইয়াতে রিদওয়ানের) বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, মানুষরা সেখানে দলে দলে গমন করছে। হযরত উমার(রাঃ) সে গাছ কেটে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। ইবনে ওদ্দাহ(রাঃ) তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইবনে ইউনুসকে বলতে শুনেছি- "রাসূল(সঃ) যে গাছের নিচে ছাহাবী(রাঃ) গনের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, উমার(রাঃ) সেটাকে কাটার নির্দেশ দিলেন। কেননা লোকেরা সেখানে গিয়ে এর নিচে নামায আদায় করা শুরু করেছিল। অতঃপর তিনি ফিৎনার ভয়ে এমনটি করেছিলেন।

আবু বাকর আল খাল্লাল(রাঃ) হুযাইফা বিন ইয়ামান(রাঃ) হতে সনদ সহকারে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা এক ব্যক্তিকে তার হাতে কোন আপদ

বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাঁধা সুতা দেখে বল্লেন- "তুমি যদি এই অবস্থায় মারা যাও, আমি তোমার জানাযা আদায়ে অংশ নেব না।" একদা সাহাবী(রোঃ) গণ রাসূল(সঃ) কে তাদের জন্য তরবারী ও আসবাব পত্র ঝুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কোন একটি গাছকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাসূল(সঃ) কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করেছিলেন। যেমন ইমাম বুখারী(রাহ্ঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে আবু আকিদ লাইছী(রোঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন– "আমরা হুনাইন যুদ্ধের পূর্বে একদা রাসূল(সঃ) এর সাথে বের হলাম। কুফরী ছেড়ে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি তখনো তা খুব বেশী দিন হয়নি। সে সময় মুশরিকদের জন্য একটি বোরুই বৃক্ষ নির্দিষ্ট ছিল। এটাকে 'যাতুল আনওয়াত' বা ঝুলানোর উপযোগী বৃক্ষ বলা হতো। মুশরিকরা এর পাশে অবস্থান করতো। এর সাথে তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও আসবাব পত্র(বরকত লাভের জন্য) ঝুলিয়ে রাখত। আমরা সেই বৃক্ষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। অতঃপর আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল(সঃ) তাদের মত আমাদের জন্যও একটি

ঝুলানো উপযোগী বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে দিন। তখন তিনি(সাঃ) বললেন–

الله أكبر هذا كما قالت بنو اسرائيل– أجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال – انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم .

"আল্লাহ মহান! এটা বানী ইসরাইলদের দাবীরই সমমানের। তারা বলেছিল-'আমাদের জন্য 'ইলাহ' নির্দিষ্ট করে দিন, যেমন তাদের 'ইলাহ' সমূহ রয়েছে।" তিনি আরো বললেন- "তোমরা নিতান্তই মূর্খ কওম। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি নীতি আঁকড়ে ধরবে।"

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁরা গাছকে ইবাদত করত না। গাছের কাছে কোন কিছু চাইত না, এর পরও কোন গাছকে যুদ্ধাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা ও এর পার্শ্বে অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট করা যদি আল্লাহর সাথে অন্য 'ইলাহ' মেনে নেয়ার সমান হয়, তাহলে কবরে অবস্থান, এর নিকটে দোয়া চাওয়া, কবর বাসীদের কাছে প্রার্থনা করা, তাদের অছীলা দিয়ে কোন কিছু চাওয়াকে আমরা কোন্ মানদে গ্রহণ করব?

যে দ্বীন সহকারে আল্লাহ তাঁর রাসূল(সঃ) কে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তির এই দ্বীন সম্পর্কে এবং বিদয়াতী ও গোমরাহ সম্প্রদায় এ বিষয়ে যা অনুকরণ করে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি অবশ্যই জানেন যে এদের মধ্যে ও পূর্ববর্তী সালফি সলিহীনের (পূর্ববর্তী মনিষীগণ) মধ্যে এ বিষয়ে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম বুখারী(রাহ্ঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে উম্মি দারদা(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন- একদা আবু দারদা(রাঃ) (তাঁর স্বামী) রাগান্বিত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁকে বললাম- আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন-"তাদের মধ্যে মুহাম্মদ(সঃ) এর রেখে যাওয়া কোন কিছুই আমি দেখিনা। তবে হ্যাঁ তারা সকলেই নামায আদায় করে।"

ইমাম যোহরী(রাহ্ঃ) বলেন- "আমি দামেস্কে আনাস বিন মালিকের(রাঃ) কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে বললাম- আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন- আমি এদের মধ্যে দ্বীনের অংশ হিসাবে নামায ছাড়া আর কিছুই

পাইনি। এই নামাযও এখানে লোপ পেয়ে গেছে।" (বুখারী)

মুবারক বিন ফাদালাহ (রাঃ) বলেন- "হাসান (রাঃ) জুম্মার নামাজ আদায় করলেন। এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো- হে আবু সায়ীদ, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন- "তোমরা তো আমাকে কাঁদার জন্য তিরস্কার করছ, বস্তুতঃ আজ যদি কোন মুহাজির তোমাদের মসজিদে উপস্থিত হন, তাহলে শুধু মাত্র একটি কিবলাকে অনুসরণ ছাড়া রাসূল (সঃ) এর যুগের কোনকিছু তোমাদের মাঝে খুঁজে পাবেন না।"

এদ্বারা তিনি অত্যন্ত বৃহৎ ফিতনার দিকেই ইংগিত করেছেন। যে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ(রাঃ) বলেছেন- "ফিৎনায় যখন তোমাদেরকে ঘিরে নিবে তখন তোমরা কি পথ অবলম্বন করবে ? সেই ফিৎনায় বড়রা বুড়ো হয়ে যাবে ছোটরা বেড়ে উঠবে আর লোকেরা এই ফিৎনাকে সুন্নত মনে করেই অনুসরণ করে যাবে । পক্ষান্তরে যখন সেখানে ফিতনাকে পরিবর্তন করা হবে- বলা হবে সুন্নাত

পরিবর্তন হচ্ছে- অথবা বলা হবে -পরিবর্তনটাই খারাপ কাজ।"

ইবনুল কাইয়িম(রোহ্ঃ) তাঁর 'ইগাছা' গ্রন্থে বলেন– "উল্লেখিত বর্ণনা সমূহ এই কথাকেই প্রমান করে যে, যখন কোন কাজ সুন্নতের বিপরীত পথে পরিচালিত হয় তখন তাতে উপদেশ নেয়ার মত কোন কিছুই থাকে না। সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করা যায় না। আর সুন্নতের পরিপন্থী এ ধরণের কাজ আবু দারদা(রাঃ) ও আনাস(রাঃ) এর সময় থেকেই শুরু হয়েছে। যেমনটি একটু আগেই আমরা জানতে পরলাম।"

অনেক মানুষ শরীয়ত বিমুখ হওয়ার কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর অপছন্দনীয় বহু বিদয়াতে জড়িয়ে আছে। তারা বাহ্যিক দিক থেকে ইবাদাত গুলোকে চালু রেখেছে ঠিকই, তবে এগুলোর অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে এগুলোকে বিদয়াতে পরিণত করেছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের আত্মার খোরাক। যদি আত্মাকে তার সঠিক খাদ্য না দিয়ে বিদয়াতকে খাদ্য হিসাবে দেয়া হয়, তখন তার মধ্যে কোন মর্যাদা আর

অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং কেউ যদি চেহারা ও আত্মার সমন্বয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, নামাযে শরীয়ত সম্মত ফরযাদি ও সুন্নাত সমূহ পালন করে, নামাযে যে সকল উওম বাক্য পাঠ ও ভাল কাজ করার নিয়ম নির্ধারিত আছে তা জানে বুঝে ও নামাযকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়- সে আত্মশুদ্ধি লাভ করে। উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। এগুলো তাকে শিরক ও বিদয়াত মুক্ত করতে সহযোগী হয়।

আর যে এগুলোতে ত্রুটি করে, তার মধ্যেই ত্রুটির পরিমাণ অনুযায়ী শিরক ও বিদয়াত বাসা বাঁধে। যে আত্মা দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, রাসূল(সঃ) এর হাদীস উপলব্ধি করে এবং অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকেই ইলম আহরণের ও হিদায়াত লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে, সেই শুধু এই উভয় প্রকারের (কুরআন ও হাদীস) উৎস হতে লাভজনক শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ঐ ইলম যে খুঁজে পায় বা হক ও বাতিলের মধ্যে, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। ঐ ইলম সে লাভ করে যা দ্বারা বিদয়াত, শয়তান ও আত্মার কুমন্ত্রনা যে সমস্ত

কুধারণার জন্ম দেয় তা থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে।

এ সমস্ত ভ্রান্ত ও বিদয়াতী কাজ গুলোকে লাভ জনক আমল দ্বারা পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যক। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালবাসা, স্মরণ, ভয়, তাঁর উপর আস্থা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের আশা প্রভৃতি দিয়ে নিজের আত্মাকে আবাদ করে, সে এই সব কাজের ভিতরে এমন সুন্নাত সম্মত পন্থা খুঁজে পায় যা তাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভালবাসার হাত থেকে মুক্ত করে। অন্যকে ভয় করা ও অন্যের প্রতি ভরসা করাথেকে তাকে হিফাজত করে। আর যখন সে তার আত্মাকে এ সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেয়ার সুন্নাত পন্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তখন সে আত্ম পূজকে রূপান্তরিত হয়। তখন তার আত্মা যেটাকে ভাল মনে করে সেটাই পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। একেই ইবাদত করতে শুরু করে।

সুতরাং তাওহীদের প্রতিদ্বন্দ্বী মেনে নিক বা অস্বীকার করুক সে কাফির। তদানুরূপ ভাবে সুন্নাতের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বীকার করুক আর নাই করুক সে বিদয়াতী ও পথ ভ্রষ্ট।

(রাসূল(সঃ) এর আনিত শরীয়তের প্রতি মুর্খতাই মানুষদেরকে শিরকে নিপাতিত করেছে)

কবর বাসীরা কারো কোন ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখেনা। কারো জীবন মরণ ও পূণঃরুত্থানের কোন ক্ষমতা তাদের নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, এগুলো জানার পরও কার হাতছানি কবরপূজকদের কবর পূজা করতে উদ্বুদ্ধ করল? উত্তরে বলা বাহুল্য যে, কয়েকটি বিষয় তাদেরকে এই অন্ধকারে নিমজ্জিত করে থাকে। যেমন- মুহাম্মাদ(সঃ) ও সকল রাসূল(আঃ) প্রেরণের যে উদ্দেশ্য একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও শিরকের সামান্য মাধ্যম পর্যন্ত বিলুপ্ত করা- এ বিষয় তাদের চরম মূর্খতা। যাদের এ বিষয় জানার ভাগ্য কম হয়েছে, যখন শয়তান তাদেরকে ফিতনার দিকে আহবান জানায়, তখন শয়তানের এই আহবানকে তারা ইল্‌ম ও বিদ্ধ্যাবুদ্ধি দ্বারা প্রতিহত করতে অক্ষম হয়। তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিমাণ অনুযায়ী শয়তানের আহবানে তারা সাড়া দেয়। পক্ষান্তরে যতটুকু ইল্‌ম ও বিদ্ধাবুদ্ধি আছে, সে অনুযায়ী শয়তানের আহ্বানকে পরাহত করে এবং

সেই ইলমের পরিমাণ অনুযায়ী খারাপ কাজ থেকে তারা মুক্ত থাকে।

কবর পূজার মত অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে- অবাঞ্ছিত মিথ্যা হাদীস সমূহ যেগুলো মূর্তিপূজকদের পৃষ্ঠপোষক কবর কেন্দ্রিক লোকেরা নিজেরাই তৈরী করেছে। যে হাদীস গুলোর রাসূল(সঃ) এর দিকে সম্বোধন একেবারেই মিথ্যা। যে গুলো তাঁর(সঃ) এ দ্বীন এবং তিনি মানুষের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এই মিথ্যা হাদীস গুলোর মধ্যে অন্যতম হাদীস গুলো হচ্ছে-

"যখন তোমরা কোন সমস্যায় অবতীর্ণ হবে তখন কবর বাসীদের শরণাপন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

"যদি কেউ কোন পাথরের উপরে ও ভাল ধারণা রাখে উক্ত পাথর তাকে সাফল্য দান করতে পারে।"

এই রূপ অসংখ্য তথাকথিত হাদীস যে গুলো স্পষ্ট দ্বীনের প্রতিদ্বন্দ্বী কবর পূজকরা রচনা করেছে। আর তাদের মত জাহিল বা পথভ্রষ্টরা এগুলোকে

মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তো যারা পাথর ও গাছের প্রতি ভালো ধারণা রাখে তাদেরকে হত্যা করার জন্য ও উম্মতকে কবরের প্রতিটি ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য রাসূল(সঃ) কে প্রেরণ করেছেন, যা ইতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

কবর পূজার আরো কারণ হচ্ছে- বিভিন্ন প্রকার কিংবদন্তী ঘটনাচক্র। যে গুলোকে কবর ভিত্তিক লোকেরাই বর্ণনা করেছে। যেমন- জনৈক ব্যক্তি জনৈক ব্যক্তির কবরের প্রার্থনা করেছিল; এদ্বারা সে বিপদ মুক্ত হয়েছে। জনৈক ব্যক্তি জনৈক কবর বাসীর কাছে প্রার্থনা করেছে অথবা এই কবর বাসীর মাধ্যমে দোয়া করেছে, সে কারণেই উক্ত ব্যক্তির সকল চাহিদা পূর্ণ হয়েছে। জনৈক ব্যক্তির প্রতি বিপদ অবতীর্ণ হয়েছিল, সে জনৈক কবর বাসীর সন্তুষ্টি চেয়েছিল এরপর সে বিপদ মুক্ত হয়েছে।

এখানে কবরের রক্ষণাবেক্ষণ ও খিদমত সম্পর্কে অনেক কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। যার আলোচনা অতি দীর্ঘ হবে। বস্তুতঃ কবরের রক্ষক ও খিদমতগাররাই হচ্ছে আল্লাহর জীবিত ও মৃত সকল

সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে মিথ্যুক। যে আত্মার চাহিদাকে গুরুত্বের সাথে দেখে, সে যখন শোনে- জনৈক ব্যক্তির কবরই হচ্ছে এ রোগের মহৌষধ, তখন সে সেদিকে আকৃষ্ট হয়। শয়তান সুযোগ বুঝে তাকে এ কাজে করুণ সুরে আহবান জানায়। অতপর সে প্রথমত কবরের কাছে অত্যন্ত একাগ্রতা ও বিনয় অবণত চিত্তে দোয়া করতে শুরু করে। আল্লাহ তখন তার একাগ্রতাও বিনয়ের দিকে লক্ষ্য করে তার দুয়া কবুল করেন। এ কবুল কবরের কারণে নয়। কেননা সে এই মন মানসিকতা নিয়ে যদি বেশ্যালয়ে, মদের আড্ডায়, গোসল খানা বা বাজারেও দোয়া করত, তাহলে তা কবুল করা হত।

পক্ষান্তরে মূর্খরা মনে করে এ দোয়া গ্রহণের কৃতিত্ব কবরেরই। আর আল্লাহ তায়ালাতো দুস্থ ও ভাগ্যাহত দের দোয়া কবুল করেন। যদিও সে কাফিরই হোক না কেন। এর অর্থ এই নয় যে- তিনি তাকে ভালবাসেন বা তিনি এর কাজকে ভাল মনে করেন। কেননা আল্লাহ সাধু-সজ্জন, গুনাহগার, মুমিন ও কাফির সকলের দোয়াই কবুল করে থাকেন।

এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা দোয়াতে বাড়াবাড়ি করে। দোয়াতে শিরক করে। এমন প্রার্থনা জানায় যা অবৈধ। হয়তবা তারা যা চায় তার কিছুটা অথবা সম্পূর্ণটাই তারা লাভ করে। তারা তখন এটাই মনে করে যে, তাদের কাজ আল্লাহর নিকট সৎ ও সন্তোষ জনক আমল বলে বিবেচিত হয়েছে। যখন তারা দেখে তাদের আশাগুলো পূর্ণ হচ্ছে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ দ্বারা তাদেরকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে, তখন তারা মনে করে আল্লাহ সকল মংগলের বহর নিয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে।

এপ্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.

"তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সকল নিয়ামতের দরজা খুলে দিলাম।" (আনয়াম-৪৪)

সুতরাং দুয়া কখনও বা ইবাদত হিসাবে গন্য হয়, দোয়াকারীকে পূণ্য দানে ভূষিত করা হয়। কখনও বা দোয়ায় চাওয়ার বিষয়কে কবুল করে দোয়াকারীর চাহিদা পূরণ করা হয়। কখনো তার এই

চাহিদা পূরণ তার জন্য ক্ষতির কারণও হয়। যে দোয়ার মাধ্যমে তার চাহিদা পূরণ হলো সে দোয়ার পদ্ধতি সঠিক না হওয়ার কারণে কখনো তাকে সাজাও দেয়া হয়। তার মর্যাদাকে ছোট করা হয়। কেননা আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন ঠিকই, তবে তাকে সাজাও দেন এই জন্য যে, সে অবৈধ পন্থায় এ বিষয় প্রার্থনা জানিয়ে নিজের কর্তব্যের অপব্যবহার করেছে ও গুনাহের সীমা লংঘন করেছে।

আসল ঘটনা হচ্ছে, শয়তান তার ধোকাকে মানুষের জন্য অত্যন্ত মনোরম ভংগীতে উপস্থাপনা করে, যাতে সে কবরে দোয়া করাকে ভাল মনে করে। এমনকি শয়তান উক্ত ব্যক্তির কাছে তার বাড়ীতে, মসজিদে ও শেষ রজনীর দোয়া থেকেও এখানের দোয়া উত্তম বলে তুলে ধরে। অতঃপর যখন সে এই ধোকায় পড়ে, এই অবস্থায় দৃঢ় হয়, তখন তাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে তাকে উক্ত কবর বাসীর মাধ্যমে দোয়া করার ব্যবস্থা করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে উক্ত কবর বাসীর নামে শপথ করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাস্তবে এ কাজ পূর্ববর্তী কাজ

গুলোর চেয়ে আরো জঘন্য। কেননা এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে শপথ করা হচ্ছে। অন্য সৃষ্টির কাছে কিছু চাওয়া হচ্ছে।

* * * *

(আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে দোয়া করা প্রসংগে আলোচনা)

পূর্বল্লোখিত কাজ গুলোকে ইসলামের সকল ইমামগণ বিরোধিতা করেছেন। কারখী(রাহ্ঃ) কিতাবের ব্যাখ্যায় আবুল হাসান আল কুদুরী(রাহ্ঃ) বলেন- বিশার বিন অলীদ(রাঃ) ইমাম আবু ইউসুফ(রাহঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা(রাহ্ঃ) বলেছেন- "আল্লাহকে বাদ দিয়ে কারো মাধ্যমে তার কাছে কিছু চাওয়া কখনো উচিত নহে। আল্লাহর আরশ সৃষ্টির অপরিসীম মর্যাদার দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়াও আমি মাকরূহ মনে করি। আমি এটা বলাও মাকরূহ মনে করি যে - জনৈক নবী(আঃ), রাসূল(আঃ) ও বায়তুল হারামের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি।"

আবুল হাসান(রাহঃ) বলেন- আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মাধ্যমে তাঁর কাছে কিছু চাওয়া ভিত্তিহীন। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কিছু দেয়ার অধিকার নেই। বরঞ্চ সমগ্র সৃষ্টজীবের বিরুদ্ধে

কাউকে কিছু দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত।

ইবনি বালাদজি 'আলমুখতার' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর মাধ্যম ছাড়া অন্য মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়াকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং কেহ জনৈক কারো দোহাই দিয়ে কিছু চাবে, এটা ঠিক নহে। স্রষ্টার কাছে সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে কোন কিছু চাওয়ার বাস্তবতা নেই; সে জন্য আপনার ফিরিশতা, আপনার নবী ইত্যাদি ইত্যাদির দোহাই দিয়েও কিছু চাওয়া অনুচিত। 'আপনার আরশ সৃষ্টির মর্যাদার দোহাই দিয়ে চাচ্ছি' এটা বলাও ঠিক নহে। তবে শেষোল্লেখিত আল্লাহর মর্যাদার দোহাই দেয়াকে আবু ইউসুফ(রাহঃ) জায়িয বলেছেন। এমনকি তিনি এই বাক্য ব্যবহার করে রাসূল(সঃ) যে দোয়া করেছেন তার প্রমাণও উল্লেখ করেছেন। কেননা 'আরশ সৃষ্টির মর্যাদা' বলতে আল্লাহর ঐ সৃষ্টি শক্তি ও কুদরতকে বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা তিনি আরশকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এখানে আল্লাহর গুণের দোহাই দিয়েই তো চাওয়া হচ্ছে। আর এটিতো অবশ্যই বৈধ।

ইমাম আবু হানিফা(রাহ্ঃ) ও তাঁর সাথী সংগীগণ যেটাকে মাকরূহ মনে করেন, ইমাম মুহাম্মদ(রাহঃ) সেটাকে হারাম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা(রাহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফের(রাহঃ) কাছে এ মাকরূহ হারামের কাছাকাছি। হারামের অংশই এতে বলবৎ।

যখন শয়তান কারো নিকটে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে সক্ষম হয় যে, সে তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের সুযোগ এই জন্যই পেয়েছে যে, সে মৃতব্যক্তির মাধ্যমে দোয়া করেছে। সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবর বাসীর নামে শপথ করেছে। সে কবর বাসীর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল ও সম্মান প্রদর্শণকারী– তখন শয়তান উক্ত ব্যক্তিকে আরো অগ্রসর করে সরাসরি উক্ত মৃতের কাছে দোয়া করা ও মানত করার ইন্ধন জোগায়। শয়তান পরে আরো অগ্রসর হয়। তাকে উক্ত কবর প্রতিমায় রূপান্তর করতে, কবরের উপরে অবস্থান নিতে, বাতি ও চেরাগ জ্বালাতে, গালিচা দ্বারা কবর ঢাকতে, কবরকে মসজিদ বানাতে, সিজদার মাধ্যমে সেখানে ইবাদত করতে, তাওয়াফ করতে, চুমু দিতে, স্পর্শ করতে,

সেখানে হজ্জ করতে, কুরবানী দিতে উদ্বুদ্ধ করে। বরং শয়তান আরো এগিয়ে উক্ত ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে এনে ছেড়ে দেয় যে, সে তখন মানুষদেরকে কবরে ইবাদত করতে, এটাকে উৎসব স্থল ও কুরবাণীর জায়গা বানাতে প্রেরণা যোগায়। সে তখন এ কাজে উভয় জীবনেই বহু লাভ আছে বলে প্রচার করে।

ইবনুল কাইয়িম(রোহঃ) তাঁর 'ইগাছা' গ্রন্থে তাঁর শাইখ থেকে বর্ণনা করেছেন- "কবরে অনুষ্ঠিত এই বিদয়াতের কয়েকটি স্তর রয়েছে। তম্মধ্যে শরীয়ত থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত স্তর হচ্ছে মৃত ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনে কোন কিছু চাওয়া, চাহিদা পূরণের প্রার্থনা জানানো। যেমনটি অনেকেই করে থাকে। বস্তুতঃ এরা প্রতিমা পূজকের অন্তর্ভূক্ত। শয়তান তাদেরকে মৃতব্যক্তি বা তাদের থেকে কিছু সময় অনুপস্থিত ব্যক্তির কাল্পনিক মূর্তি তৈরী করার ইন্ধন এমন ভাবে যোগায় যেমন ভাবে সে মূর্তি পূজকদের জন্যও যোগায়ে থাকে। কেননা সেতো এই কবর বাসীকেই ড়াকে, যাকে সে সম্মান প্রদর্শন করে কিছু গায়েবী কথা বার্তা বলে। বস্তুতঃ শয়তানতো আদম

সন্তানদেরকে তাদের জ্ঞানের শক্তি অনুযায়ীই পথভ্রষ্ট করে থাকে। শয়তান এই একই পদ্ধতিতে নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য পূজকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। শয়তান তাদের কাছে প্রথমতঃ অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে এমন কিছু কথা বার্তা ও ঘটনা শুনায় যা নক্ষত্রের রূহানী শক্তির বলেই ঘটেছে বলে প্রমাণ বহন করে। বস্তুতঃ সেটা শয়তানেরই কাজ। শয়তান যদি ঘটনা চক্রে মানুষদের সামান্য উপকার করে, যতটুকু সহযোগীতা এ উপকার করতে যেয়ে করে থাকে তার চেয়ে বহুগুণে তাদের ক্ষতি সাধনই তার উদ্দেশ্য থাকে। ঠিক এভাবেই কবর পূজকরা কবরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে উপলব্ধি করে এটাকে কিরামত বলে মেনে নেয়। বাস্তবে এটা শয়তানেরই কারসাজি। উদাহরণ স্বরূপ- কোন লোককে শয়তান অজ্ঞান করে ফেলে। তাকে কবরে নিয়ে গেলে শয়তান তাকে ছেড়ে যায়। তখন পথভ্রষ্টরা এটাকে কবরের কেরামতি বলে মনে করে। আসলে শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করার জন্যই এ পথ অবলম্বন করে থাকে।

শয়তানের অন্যতম বড় ষড়যন্ত্র হচ্ছে মানুষের জন্য তার উদ্ভাবিত প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক তীর,

যে গুলো শয়তানী নাপাক কর্ম-কা রে অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ এগুলো পরিত্যাগ করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সফলতা লাভের জন্য এ গুলো পরিহার করে চলার শর্তারোপ করেছেন। আল্লাহর ভাষায়-

يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والا نصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .

"হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতীমা সমূহ ও ভাগ্য নির্দেশক তীর সমূহ শয়তানের নাপাক কর্মকান্তের অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর যদি তোমরা সফলতা লাভ করতে চাও, তাহলে এগুলোকে বর্জন কর।" (মায়িদা-৯০)

এখানে (انصاب) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা (نصب) এর বহু বচন। এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু দাঁড় করা, প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে কোন জিনিসকে ইবাদতের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাই (نصب) নুছুব। তাই গাছ হোক, পাথর, প্রতিমা কিংবা কবরই হোক না কেন।

হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনি জুরাইজ(রাহঃ) বলেন ক্বাবার চারিপাশে অনেক পাথর পড়েছিল। জাহিলী যুগে এগুলোকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। সেগুলোকে পূজা করা হতো। পশু কুরবানী দেয়া হতো তার উপরে। তার উপরে গোশত কেটে টুকরা টুকরা করা হতো।

এগুলো কিন্তু প্রতিমা ছিল না। প্রতিমা হচ্ছে যেগুলো প্রতিকৃতি হিসাবে তৈরী করা হয়। যেগুলো খোদাই বা অংকন করা হয়।

মানুষ যেগুলোর উদ্দেশ্যে তাদের ইবাদতকে নিবেদন করে,তাই প্রতিমা বা মূর্তি হিসাবে ধরা হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে শয়তান মানুষের জন্য গাছ, খুঁটি, কবর, যেগুলোকে পূজার বস্তুতে পরিণত করেছে, সে গুলো সবই মূর্তি ও প্রতিমার অন্তর্ভূক্ত। এগুলো ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই হচ্ছে ওয়াজিব। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) যখন খবর পেলেন- যে গাছের নিচে রাসূল(সঃ) ছাহাবীদের(রাঃ) বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, লোকেরা সেখানে আনাগোনা করছে, তৎক্ষনাৎ তিনি লোক পাঠিয়ে সে গাছটিকে

কেটে ফেললেন। যার নিচে স্বয়ং রাসূল(সঃ) বাইয়াত গ্রহণ করেছেন; যে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة .

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা তোমার কাছে গাছের নিচে বাইয়াত করছিল।" (ফাতাহ-১৮)

এর পরও ওমর (রাঃ)সেটা কেটে ফেললেন। তাহলে এই সমস্ত পূজার বস্তু যা ফিতনাকে বড় আকারে ছড়াচ্ছে; যার কারনে ক্রমশঃ বিপদ বেড়ে যাচ্ছে এই সমস্ত মূর্তির পরে কি হুকুম বর্তায় বলে আমরা মনে করতে পারি?

আরো বড় প্রমাণ যে, রাসূল(সঃ) মসজিদে দিরার(১) ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এথেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কবরের উপরে তৈরী মসজিদ যেহেতু উক্ত মসজিদের চেয়ে আরো বড় আকারের বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে, সেহেতু তা অবশ্যই

(১)শত্রুদের দ্বারা নির্মিত মসজিদে নববীর প্রতিদ্বন্দ্বী মসজিদ।

নিশ্চিহ্ন করে ফেলা উচিত। এটা মাটির সমান না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে ফেলাই হচ্ছে এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ।

তদানুরূপ কবরের উপরে তৈরী গম্বুজও ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। কেননা এটি রাসূল(সঃ) এর বিরোধিতা করার জন্যই নির্মিত হয়েছে। আর যা কিছু গুনাহের জন্য ও রাসূল(সঃ) এর বিরোধিতার জন্য নির্মিত হয় সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা 'মসজিদে দিরার' ভেঙ্গে ফেলার চেয়েও উত্তম। কেননা রাসূল(সঃ) কবরের উপরে ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন। যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করবে, তাদেরকে তিনি(সঃ) লানত করেছেন। তিনি(সঃ) মাটির উপরে উঁচু করে দেয়া কবরকে ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, যা রাসূল(সঃ) নিষেধ করেছেন এবং যার কর্তাকে লানত দিয়েছেন এগুলোকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়া প্রয়োজন। ঠিক তদানুরূপভাবে কবরে জ্বালানো সকল চেরাগ,ধুপ বাতি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা উচিত। কেননা যারা এগুলো করে তারা লানতের যোগ্য। আর আল্লাহ

তাঁর দ্বীন ও রাসূল(সঃ) এর সুন্নতের সাহায্যকারী ও সমাজ থেকে এগুলো নিশ্চিহ্ন কারীদেরকেই প্রতিষ্ঠা করবেন।

ইমাম আবু বাকর তরতুশী(রাহঃ) বলেন- "আল্লাহর রহমত তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। তোমরা যখন কোন বারুই বৃক্ষ বা কোন গাছের উদ্দেশ্যে মানুষদের ব্যস্ত দেখবে, যখন দেখবে তারা এগুলোকে সম্মান প্রদর্শন করছে, এথেকে রোগ মুক্তি কামনা করছে, এর মাধ্যমে পেরেক বা কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করছে তাহলে এ বৃক্ষটিই হচ্ছে 'যাতুল আনওয়াত' ঝুলানো উপযোগী বৃক্ষ। এটাকে কেটে ফেল।"

আবু শামাহ নামে প্রসিদ্ধ হাফিজ আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন ইসমাইল(রাহঃ) তাঁর 'আলহাওয়াদিছ আল বিদায়া' গ্রন্থে এবিষয়ে আরো বলেছেন- "যে সমস্ত জিনিষকে আকর্ষনীয় ভাবে উপস্থাপন করে জন সাধারণের মধ্যে শয়তান ফিতনার বীজ ছড়াচ্ছে, তম্মধ্যে কিছু দেওয়াল ও খুঁটি নির্মাণ অন্যতম।" সেখানে তিনি নির্দিষ্ট শহরের নির্দিষ্ট জায়গাকে উল্লেখ করে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর

ঘটনা পঞ্জি উল্লেখ করেছেন। ঘটনা বর্ণনাকারী বলে যে, সে রাত্রিতে একজন দ্বীন সংশোধক বা অলীকে স্বপ্নে দেখল, সে উক্ত স্থানে এই এই কাজ করেছে। আর যায় কোথায়, ঘটনা শুনতেই মানুষেরা আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ ও রাসূল(সঃ) এর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কাজগুলো রপ্ত করতে শুরু করে। তাদের ধারণা তারা এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এরপর তারা এই পর্ব অতিক্রম করে। যে জায়গাগুলোতে উক্ত সাধু-সজ্জনদেরকে স্বপ্নে দেখা গিয়েছে সে স্থান গুলোকে তারা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে। এর মাধ্যমে তারা তাদের রোগীদের রোগমুক্তির আশা করে। এখানে মানত করে। এর মাধ্যমে নিজের চাহিদা মিটাতে চায়। উক্ত স্থানে বৃক্ষ পাথর, দেয়াল ও কূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু তারা বলে নিশ্চয় এই গাছ, এই পাথর, এই কুপ মানত গ্রহণ করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে।

বস্তুতঃ অন্যের নামে মানত করা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ইবাদত করারই নামান্তর। কেননা মানত ইবাদতের মধ্যে একটি। মানত দ্বারা মানত

কারী যার উদ্দেশ্যে মানত করে তার নৈকট্য লাভ করে। শুধু তাই নয় বরং তারা উক্ত গাছ, পাথর প্রভৃতিকে সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে স্পর্শ করে ও চুমু খায়।

যে পাথরকে আল্লাহ স্বয়ং নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ করেছেন, সালফি সলিহীনরা উক্ত পাথরকেও সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আযরকী(রোহঃ) তার 'মককহ' নামক গ্রন্থে হযরত কাতাদাহ(রাহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহর বাণী-

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.

"তোমরা মাকামি ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর।" (বাকারা-১২৫) সম্পর্কে বলেন- এখানে আল্লাহ নামায আদায় করতে নির্দেশ করেছেন। একে স্পর্শ করতে অনুমতি দেননি।" বরং সকল উলামা(রেহঃ) এবিষয়ে একমত যে, কাবা ঘরের শুধু মাত্র 'হাজরি আসওয়াদ' বা 'কাল পাথর' ব্যতীত অন্যকিছুতে স্পর্শ করা বা চুমু দেয়ার

অনুমতি নেই। 'রুকনী ইয়ামানী' স্পর্শের অনুমতি আছে তবে চুমু দেয়ার নির্দেশ নেই।

পূজার বস্তু সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে কবর বাসীদের নিয়ে ফিতনা। ছাহাবী(রাঃ) ও তাবেয়ী(রহঃ) গণের ভাষায়- মূলতঃ এটি মূর্তি পূজকদেরই ফিতনা। কেননা মানুষরা যাদেরকে সাধু-সজন বলে বিশ্বাস করে শয়তান তাদের কবরকে তাদের সামনে পূজার বস্তু হিসাবে তুলে ধরেছে। অতঃপর তাদেরকে উক্ত কবর বাসীদের কল্পিত মূর্তি বানিয়ে আল্লাহকে ছেড়ে তাকে পূজা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে শয়তান তার চেলাদের কাছে এই বলে নির্দেশ পাঠিয়েছে যে, যারা এই কবরকে পূজা করবে না, কবরকে উৎসব স্থলে বানাবে না, একে মূর্তিতে পরিণত করবে না তারা উক্ত সাধু-সজ্জনদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করল। তাদের অধিকারকে খর্ব করল। এই নির্দেশ পাওয়ার পর মূর্খরা শয়তানের এই কর্মকা ের বিরোধীদেরকে সাজা দেয়। এমনকি তাদের মৃত্যু দ প্রদান করে। তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা দেয়। বস্তুতঃ এসমস্ত শয়তান বিরোধীদের কোন দোষ ছিল না। দোষ ছিল এতটুকু যে তারা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সঃ) যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার নির্দেশ দিত, যা থেকে তারা নিষেধ করেছেন তাইই নিষেধ করত।

* * * *

সায়ীদ বিন জুবাইরের(রোঃ) ভাষায় ভাগ্য নির্দেশক তীর অর্থ হচ্ছে- "জাহিলী যুগের নির্দিষ্ট কিছু পাথর। কেহ যুদ্ধে যেতে চেলে অথবা বাড়ীতে অবস্থান করতে চেলে এই পাথরদ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করত। অর্থাৎ তার ভাগ্যে কি আছে তা এগুলোর মাধ্যমে অনুসন্ধান করত।"

তিনি আরো বলেন- "এ পদ্ধতির অর্থই হচ্ছে দু'টি তীর, যা দ্বারা জাহিলী যুগে বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা হতো। একটির উপরে লেখা থাকতো 'আমার রব্ব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন', আর অপরটিতে লেখা থাকত 'আমার রব্ব আমাকে নিষেধ করেছেন।' যখন তারা কোন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করত, এদু'টি তীরের দ্বারা লটারী করত। যদি 'আমার রব্ব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন' এই তীরটি বের হয়ে আসত, তবে যা সে করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল তাইই করত। আর যদি দ্বিতীয় তীরটি বের হয়ে আসত তাহলে সে উক্ত কাজ করা থেকে বিরত থাকত।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وأن تستقسموا بالأزلام.

"তীরেরদ্বারা ভাগ্য নির্ধারণকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" (মায়িদা-৩)

আযহারী(রাহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- "এর অর্থ হচ্ছে দুইয়ের মধ্যে কোনটি তার ভাগ্যে রাখা হয়েছে তীরের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা।"

ইমাম আবু ইসহাক যাজ্জাজ(রাহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন- "তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ একেবারেই হারাম। তীরেরদ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ ও জ্যোতিষীর উক্তি- এই নক্ষত্র উদয় হলে তুমি বাড়ী হতে বের হবে না অথবা এই নক্ষত্র উদয় হলে তুমি বাড়ী থেকে বের হবে- এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন-

وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا .

"কেউ আগামী কাল কি উপার্জন করবে তা সে জানে না।" (লুকমান-৩৪)। সেহেতু অদৃশ্য সব কিছু আল্লাহরই জানার বিষয়। এ জন্য অন্য কিছুর মাধ্যমে এটা অনুসন্ধান করা হারাম।

আমাদের সমাজে কুরআনের দ্বারা 'শুভ' ও 'অশুভ' নির্ধারণের বিষয়টিও পূর্বোল্লোখিত বিষয়ের অর্ন্তভূক্ত। দানিয়াল (আঃ) অন্য কিছু দ্বারাও 'শুভ' ও 'অশুভ' নির্ধারণকে তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণের অর্ন্তভূক্ত বলেছেন। এটি না জায়েয। এর প্রতি বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কেননা কুরআন মজিদ দ্বারা হলেও গায়েবী বিষয়েই 'শুভ'-'অশুভ' নির্ধারণ করা হয়। উত্তম অর্থ বহণ কারী কোন শব্দ যেমন-" সফল কাম ", "সঠিক পথের পথিক" প্রভৃতি বলা সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عن أنس رضى الله عنه أنه عليه السلام قال –لا عدوى ولاطيرة ويعجبنى الفأل– قالوا وما الفأل؟ قال –كلمة طيبة .

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন- সংক্রামক রোগ বা অশুভ বলতে কিছু নেই, আর 'ফাল' আমার কাছে পছন্দনীয়। সাহাবী (রাঃ) গন বললেন- 'ফাল' এর অর্থ কি? তিনি (সঃ) উত্তর দিলেন- উত্তম কথা ।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ-

روى الترمزى رحمه الله عن أنس رضى الله عنه أنه عليه السلام كان يعجبه إذا خرج احاجة أن يسمع – يا راشد، يانجيح .

ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন- রাসূল(সঃ) কোন প্রয়োজনে বের হওয়ার সময় 'হে সঠিক পথের পথিক, হে সফলকাম' এর কথা শুনতে পছন্দ করতেন।

মূল কথা হলো-আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যখন দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে কোন সমস্যার মুখোমুখি হন, তখন ইস্তিখারা(১) করেন।

যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

روى البخارى فى صحيحه عن جابر– رضى الله عنه –أنه قال– كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة فى الأموركلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول– إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل– اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك--من فضلك العظيم فإنك تقدر و لا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت

(১)কোনটি মংগল আল্লাহর কাছ থেকে তার ফয়সালা চাওয়া।

تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى و آجله فاقدره لى ويسره لي ثم بارك لى فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمرشر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدرلى الخير حيث كان ثم رضنى بـه .

ইমাম বুখারী(রাহঃ) তার ছহীহ গ্রন্থে হযরত জাবির(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- রাসূল(সঃ) আমাদেরকে যেমন কুরআনের শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনি ভাবে সকল বিষয় ইস্তিখারার পদ্ধতিও শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন- "যখন কোন বিষয়ে কেউ ইচ্ছা পোষন করে, সে তখন ফরয নয়, এমন দুই রাকাত নামায আদায় করবে অতঃপর বলবে- اللهم إنى أستخيرك – –ا رصنى به .

"হে আমার আল্লাহ , আমি নিশ্চয় আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আমার জন্য কোন কাজটি মঙ্গল তা কামনা করছি। আমি সহযোগিতা চাচ্ছি আপনার কুদরতের। আপনার বিশাল অনুগ্রহ থেকে দান প্রার্থনা করছি। কেননা আপনি ক্ষমতার আধার আর আমি অক্ষম, আপনি বিজ্ঞ, আমি মূর্খ আর আপনি

সকল অদৃশ্য বিষয় পূর্ণাঙ্গ ভাবে জ্ঞাত। হে আমার আল্লাহ, আপনার জ্ঞানে যদি এই থাকে যে এই কাজে আমার ধর্মীয় দিকে, আমার জীবন যাপনে এ কাজের পরিণামে বা বর্তমানে আমার জন্য কল্যান রয়েছে, তাহলে এটি সম্পন্ন করতে আমাকে শক্তি দিন, এ কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। অতঃপর এ কাজে আমাকে আপনি বরকত দান করুন। আর যদি আপনার জ্ঞানে এই থাকে যে এ কাজে আমার ধর্মীয় দিকে, আমার জীবন যাপনে , এ কাজের পরিণামে বা বর্তমানে আমার জন্য অমংগল রয়েছে, তাহলে এ কাজকে আমাথেকে ও আমাকে এ কাজ থেকে দূরে রাখূন। আর যে কাজে আমার জন্য মংগল রয়েছে, সেটাই তকদীরে নির্ধারণ করুন এর পর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।"

কিন্তু পাপী ও মূর্খ যারা সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে তারা যখন কোন কাজ করতে মনস্থ করে জ্যোতিষী ও গণকের দূয়ারে কিংবা যারা পাথর ও পাখী দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করে, তাদের কাছে ধর্ণা দেয়। তারা এ মূর্খকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা তেমন খেলা করে। আর উক্ত মূর্খও তাদের কাছে বেশী বেশী প্রশ্ন

করে নিজের মূর্খতা ও ক্ষতিকে বাড়িয়ে তুলে। তারা যা বলে তাই সে বিশ্বাস করে। সে তাদের পারিশ্রমিক দেয়। একাজ এ বেচারার আখিরাত ও দুনিয়াকে কিভাবে বরবাদ করছে সে তা জানে না।

যেমন বর্ণিত হয়েছে-

أنه عليه السلام قال- من أتى كاهنا، فسأله عن أمر ثم صدقه بما أخبربه لم تقبل صلاته أربعين صباحا - وفى رواية (من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ,, عليه السلام ،،)

" রাসূল (সঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি গণকের কাছে এল, কোন বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করল এবং তার উত্তরকে বিশ্বাস করল, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না।" অন্য বর্ণনায় আছে-

" যে গণককে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।"

গণক ও জ্যোতিষী মাটি, পাথর, যব বা অন্য যে কোন মাধ্যমেই ভাগ্য নির্ধারণ করুক না কেন, সবই (অবৈধতার মাপ কাঠিতে) সমমানের।

মূল কথা হচ্ছে-অনেক মানুষই 'পূজার বস্তু' ও তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুতঃ কোন সৃষ্টকে পূজার বস্তুতে পরিণত করার উদ্দেশ্যই হয় একে আল্লাহর সাথে শরীক করা ও একে ইবাদত করা। পক্ষান্তরে ভাগ্যে কি আছে, তা জানার জন্য যে জ্ঞান অন্বেষণ আল্লাহ মানুষের সাধ্যাতীত করেছেন তা অন্বেষণ করাই হয় তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য। সুতরাং এটি হচ্ছে জ্ঞান বিষয়ক ও প্রথমটি আমল বিষয়ক। আল্লাহর দ্বীন এই উভয় কাজেরই বিরোধী। আল্লাহর রাসূল (সঃ) এই দুইটি কেই উৎখাৎ করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

আল্লাহই সাহায্য কারী। আল্লাহ ভরসাস্থল। মহান আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

* * * *

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

في منطقة البطحاء

ص.ب: ٢٠٨٢٤ الرياض ١١٤٦٥

هاتف: ٤٠٣٠٢٥١ - ٤٠٣٠١٤٢ - ٤٠٣٤٥١٧ - ٤٠٣١٥٨٧

فاكس: ٤٠٥٩٣٨٧

تحت إشراف

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

حقوق الطبع محفوظة للمكتب

لا يسمح بطبع أي جزء من هذا الكتاب إلا بعد موافقة خطية مسبقة من المكتب

زيارة القبور الشرعية والشركية

باللغة البنغالية

تأليــف

الإمام محي الدين محمد البركاوي

ترجــمة

أبو صالح محمد طريق الإسلام

زيارة القبور الشرعية والشركية

(باللغة البنغالية)

تأليف

الإمام محي الدين محمد البركاوي

ترجمة

أبو صالح محمد طريق الإسلام

برنامج
وفرعها في السماء
دعوة للمساهمة في دعم
خمسة أنشطة للمكتب
بمبلغ خمسين ريال
توزع كالتالي :

ردمك : ١- ٠١- ٧٩٨- ٩٩٦٠

للمساهمة في البرنامج

الايداع في الحساب رقم ٤/ ٦٣٩٠ فرع ١٨٥ الراجحي وإرسال صورة الايداع على فاكس المكتب : ٤٠٥٩٣٨٧
أو التكرم بالحضور إلى مقر المكتب أو التحويل عن طريق الصراف الآلي إلى الحساب رقم ١٨٥٠٠٦٣٩٠٤

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
وهاتف : ٤٠٣٠٢٥١ - ناسوخ : ٤٠٥٩٣٨٧ - ص.ب ٢٠٨٢٤ - الرياض ١١٤٦٥